হীরকের কথা

শ্রীঅমিয়কুমার দত্ত

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহু বিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই ; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্ব গ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০ সাল হইতে এযাবৎ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ১১৫ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ প্রেরিত হইবে।

হীরকের কথা

শ্রীঅমিয়কুমার দত্ত

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

নিবেদন

এই পুস্তিকায় রত্নবিজ্ঞানের হীরক-সম্বন্ধীয় কথা সাধারণের উপযোগী করিয়া পরিবেশন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। আমার এই প্রচেষ্টায় বন্ধুবর শ্রীঅক্ষয়নাথ সেন ও শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস, এবং শ্রীমুক্তিকুমার আয়কাৎ, শ্রীঅমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীদিলীপকুমার সেনগুপ্ত যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ
রাচী

শ্রীঅমিয়কুমার দত্ত

যেসকল পদার্থ বিশেষভাবে মনোহর, স্থায়ী ও দুষ্প্রাপ্য তাহারাই রত্ন হিসাবে আদৃত হইয়া থাকে। মানুষের রুচির উপরও রত্নের আদর ও ব্যবহার নির্ভর করে। রত্ন বলিতে আমরা হীরক, চুনি, নীলা, পান্না ও মুক্তাকেই বুঝি। ইহাদের মধ্যে মুক্তা জৈব পদার্থ। বাকী সব খনিজ মণিক (mineral)। যেসকল পদার্থে মনোহারিতা, স্থায়িত্ব ও দুষ্প্রাপ্যতা প্রভৃতি গুণাবলী অল্পমাত্রায় বিদ্যমান তাহাদিগকে উপরত্ন (Semiprecious stones) বলে, যেমন গোমেদ (Zircon, ভুলক্রমে Garnet নামেও চলে), সৌগন্ধিক (Spinel), পোখরাজ বা পুষ্পরাগ (Topaz), বৈদূর্য (Chrysoberyl) ইত্যাদি। যাবতীয় রত্নের মধ্যে হীরকের স্থান অদ্বিতীয়।

ভৌত গুণ— Physical properties

হীরক সর্বপ্রকার পদার্থের মধ্যে কঠিনতম। সংস্কৃতে ইহার অন্য নাম বজ্র। এই কথাটিতেও উহার কঠোরতার সূচনা পাওয়া যায়। ইহার ইংরেজী নাম diamond। ইহা আসিয়াছে গ্রীক adamas কথা হইতে। উহারও অর্থ কঠিন ও দুর্ভেদ্য। পুরাকালে লোকদের বিশ্বাস ছিল যে, ছাগরক্তে না ধুইয়া ইহাকে কাটা যায় না।

মণিকবিদ্যায় (Mineralogy) মণিকের কঠোরতা নির্ণয় করিবার জন্য কয়েকটি মান-নির্ণায়ক মণিক নির্বাচন করা হইয়াছে। জার্মান মণিকবিদ্ মোজ (Mohs) কর্তৃক প্রস্তাবিত দশটি মাপক মণিকের মধ্যে হীরককে কঠিনতম বলিয়া সর্বোচ্চ মান দশ দেওয়া হইয়াছে। হীরক ও অপর নয়টি মণিকের সাহায্যে অন্য মণিকের আপেক্ষিক কঠোরতা নির্ণয় করা হয়। অধুনা আবিষ্কৃত নর্বাইড (Norbide) নামক পদার্থের

কঠোরতা প্রায় হীরকের সমান— সামান্য কিছু কম। নর্বাইড (বোরন কার্বাইড— Boron carbide) একটি রাসায়নিক পদার্থ।

হীরকের কঠোরতার তারতম্যের বিষয়ে কখনো কখনো শোনা যায়। কেলাসিত (Crystallised) হীরকের বিভিন্ন রূপের বিভিন্ন পার্শ্বে বিভিন্ন প্রকার কঠোরতা দেখা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া স্থান বিশেষের হীরকখণ্ডেরও কঠোরতার তারতম্যের সংবাদ পাওয়া যায়। বোর্নিও ও অস্ট্রেলিয়ার হীরকখণ্ডের কঠোরতা দক্ষিণ-আফ্রিকার হীরকের কঠোরতা অপেক্ষা বেশি। দক্ষিণ-আফ্রিকার হীরকের বায়ুর সংস্পর্শে কঠোরতা বৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া যায়। কখনো কখনো একই স্থানে প্রাপ্ত বিভিন্ন হীরকখণ্ডের কঠোরতার ইতর-বিশেষ পার্থক্যের কথা শোনা যায়। হীরকের কঠোরতার তারতম্য হীরকের কেলাসনের বৈশিষ্ট্য কিম্বা হীরকের যমলতার (twinning) জন্য হইতে পারে। নূতন স্থানের হীরক বিষয়ে দুরভিসন্ধির জন্যও মণিকারগণ ঐরূপ রটাইতে পারে।

কঠোরতা-গুণের জন্যই রত্নরূপে ব্যতীত কাঁচ কাটিতে, কলকারখানাতে ধাতুখণ্ড ও প্রকৃতিতে শিলা ছিদ্র বা বিদ্ধ করিতে (drilling), রত্নাদির (বিশেষতঃ হীরকের) মসৃণতা আনিতে, ঘর্ষকরূপে (abrasive) বৈদ্যুতিক বাল্‌বের (bulb) জন্য সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করিতে হীরকের বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে ঔষধরূপে হীরকের ব্যবহার দেখা যায়। আয়ুর্বেদ-মতে হীরক আয়ু, পুষ্টি, বল, বীর্য, বর্ণ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি করে এবং ক্ষয় প্রভৃতি বহুরোগ নাশ করে। তদ্ব্যতীত হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহদোষ শান্তির (বিশেষ করিয়া শুক্রগ্রহের) জন্য হীরক-ধারণের বিধি আছে। পাশ্চাত্য জ্যোতিষ-মতে কাহারও এপ্রিল মাসে জন্ম হইলে তাহার পক্ষে হীরক ধারণ প্রশস্ত। কতকগুলি হীরকের পয়া আর

কতকগুলির অপয়া হিসাবে প্রসিদ্ধি ও অপবাদ আছে। এইসকল বিশ্বাসের পক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায় নাই।

রত্ন হিসাবে হীরকের আদরের অন্যতম কারণ ইহার দ্যুতি (lustre)। প্রকৃতিজ অবস্থায় হীরকের তত দ্যুতি থাকে না। তখন হীরকখণ্ডকে অনেকটা গঁদের মত দেখায়। রত্নখণ্ডরূপে কাটিবার পর হীরকের সর্বজনপ্রিয় দ্যুতি বাহির হয়। দ্যুতি ও মনোহারিতা বৃদ্ধির জন্যই বৃহৎ হীরকখণ্ডকে কাটিয়া ছোট করা হইয়া থাকে।

এক পদার্থ হইতে ভিন্ন পদার্থে গমনকালে আলোকরশ্মির সাধারণত মূলপথ হইতে বক্রীভবন বা প্রতিসরণ (refraction) ঘটে। আমরা সূর্যের যে আলোক দেখিতে পাই উহাতে বেগুনী, ঘননীল, নীল, সবুজ, পীত, নারঙ্গ বা কমলা ও লাল এই সাতটি বর্ণের আলোকরশ্মি আছে। রামধনু উঠিলে অথবা ত্রিশিরা কাঁচখণ্ডের (prism) সাহায্যে এই বিভিন্ন বর্ণের রশ্মির অস্তিত্ব জানা যায়। এইসকল আলোকরশ্মির সকলের সমপরিমাণ বক্রীভবন হয় না, বিভিন্ন রশ্মির বিভিন্ন মাত্রার বক্রীভবন ঘটে। বক্রীভবনের পূর্বে ও পরে আলোকরশ্মির অবস্থান হইতে একটা অনুপাত বাহির করা হয়। ঐ অনুপাতকে প্রতিসরাঙ্ক (refractive index) বলে। প্রতিসরাঙ্ক হইতে সাধারণভাবে আলোকরশ্মির বক্রীভবনের পরিমাণ জানা যায়।

হীরকখণ্ডের মধ্যে আলোকরশ্মির বক্রীভবনের আধিক্যই হীরকের দ্যুতির কারণ (১নং চিত্র)। হীরকের প্রতিসরাঙ্ক লাল আলোকরশ্মির ক্ষেত্রে ২·৪০২, পীত রশ্মির ক্ষেত্রে ২·৪১৭, সবুজ রশ্মির ক্ষেত্রে ২·৪২৭ এবং বেগুনী রশ্মির ক্ষেত্রে ২·৪৬৫। বেগুনী ও লাল রশ্মির প্রতিসরাঙ্কের পার্থক্য পদার্থের আলোকরশ্মি বিচ্ছুরণ শক্তির (dispersion) মাপক। হীরকের ক্ষেত্রে উহা ·০৬৩। একমাত্র স্ফালেরাইট (sphalerite)

নামক দস্তার মণিক ব্যতীত আর কোনো মণিকের এত অধিক বিচ্ছুরণ ক্ষমতা নাই। ইহারই জন্য হীরকখণ্ডে রামধনুর বর্ণবৈচিত্র্য (fire অথবা rainbow flash) দেখা যায়।
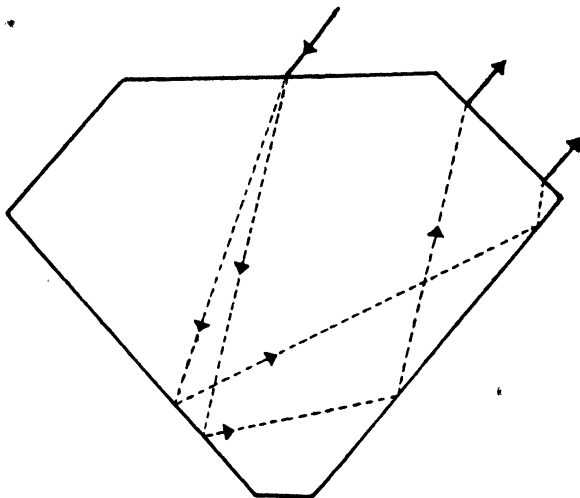
চিত্র ১। হীরকখণ্ডের মধ্যে আলোকরশ্মির বক্রীভবন

কঠোরতার ন্যায় হীরকের প্রতিসরাঙ্কও স্থান বিশেষে পৃথক হইতে দেখা যায়। পৃথিবীর মধ্যে ভারতীয় হীরকখণ্ডের প্রতিসরাঙ্ক সর্বাধিক। এই জন্যই ভারতীয় হীরকের এত চমক ও আদর।

তাপের পরিবর্তনে প্রতিসরাঙ্কেরও পরিবর্তন হইতে পারে। বর্ণহীন ও স্বচ্ছ হীরকখণ্ড হইতে উৎকৃষ্ট রত্ন বাহির হয়। এই জন্য এই শ্রেণীর হীরককে ফার্স্ট ওয়াটার (first water) অথবা ফাইনেস্ট ওয়াটার (finest water) হীরক বলা হয়। ঈষৎ পীত বা ঈষৎ পিঙ্গল বর্ণের হীরককে অফ কলার (off colour) হীরক বলা হয়। রত্নের উপযোগী

হীরকখণ্ডের বর্ণ ঈষৎ নীল, সবুজ ও আরক্তও হইতে পারে। শেষোক্ত বর্ণের হীরক দুষ্প্রাপ্য। কৃষ্ণ ও ধূসর বর্ণের হীরকও পাওয়া যায়। সাধারণত বর্ণহীন হীরকখণ্ডগুলিকে ক্ষুদ্রাকারে ও বর্ণবিশিষ্ট হীরকখণ্ড-গুলিকে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারে পাওয়া যায়। ঈষৎ পীত বর্ণের মধ্যেও পৃথিবীর কয়েকটি বিখ্যাত হীরক রত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। হীরকখণ্ডের পীত বর্ণের মাত্রাও কমবেশি হইতে পারে। প্রায় বর্ণহীন অথবা শ্বেত হইতে আপীত, পীত, ঘনপীত ও কমলালেবুর বর্ণ হীরকখণ্ডে দেখা যাইতে পারে। পিঙ্গল শ্রেণীর হীরকখণ্ডের মধ্যেও বর্ণভেদ দেখা যায়। রক্তাভ পিঙ্গল, বেগুনী, পিঙ্গল ও গোলাপী বর্ণের হীরকও পাওয়া যায়। পিঙ্গল শ্রেণীর হীরকের মূল্য কম। ধূসর ও কৃষ্ণবর্ণের হীরক নিকৃষ্ট শ্রেণীর। ধূসর বর্ণের বোর্ট (Bort, Boart, Boort, ও Bortzও বলা হয়) ও কৃষ্ণ বর্ণের কার্বনেডো (Carbonado ; Carbonও বলা হয়) রত্নরূপে ব্যবহৃত হয় না। বোর্ট শ্রেণীর হীরকখণ্ডের মধ্যে গ্রাফাইট (Graphite) নামক মণিকের আঁশ দেখিতে পাওয়া যায়। বোর্ট সহজেই ভাঙিয়া যায়। বোর্টের গাত্র অত্যন্ত বন্ধুর ও উহাতে সম্ভেদ (cleavage অর্থাৎ ভাঙিবার স্বাভাবিক প্রবণতা) অল্পমাত্রায় বিদ্যমান। কৃষ্ণ বর্ণের কার্বনেডো অত্যন্ত শক্ত। এ কারণ কলকারখানায় ও শিলার ভেদ কার্যে ইহার একমাত্র ব্যবহার হয়। রত্ন হিসাবে উহার ব্যবহার নাই। সমআয়তন হীরকখণ্ড (রত্ন) অপেক্ষা কার্বনেডো অপেক্ষাকৃত হালকা। কার্বনেডো অনেক সময় বৃহৎখণ্ডে পাওয়া যায়। বোর্ট দক্ষিণ আফ্রিকাতে ও কার্বনেডো ব্রাজিলের বাহিয়া (Bahia) নামক স্থানে অধিক পাওয়া যায়। ব্রাজিলে বোর্টও পাওয়া যায়।

হীরকখণ্ডের মধ্যে বহু সময় অন্য বহুবিধ মণিকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ প্রোথিত পাওয়া যায়। সাধারণত গ্রাফাইটের আঁশ ও তামড়ির

(Garnet) ক্ষুদ্র কণিকা এইরূপে হীরকখণ্ডের মধ্যে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া পাইরক্সিন (Pyroxene) জাতীয় মণিক ও ইলমেনাইট (Ilmenite), ক্রোমাইট (Chromite), হেমাটাইট (Hematite), গোমেদ (Zircon) প্রভৃতি মণিকের কণিকাও কখনো পাওয়া যায়। কেলাসন-বৈচিত্র্যে হীরকখণ্ডের মধ্যে হীরক-কণিকার অস্তিত্বও অজ্ঞাত নহে। মণিকার রত্ন কাটিবার সময় এইগুলিকে কঠিন গিঁট (knot) রূপে পাইয়া থাকে। কখনো কখনো গ্রাফাইট প্রভৃতি মণিক হীরক-খণ্ডের উপর আবরণ রূপে বিদ্যমান থাকে।

হীরকের বর্ণভেদের কারণ সঠিক ভাবে আজও নির্ণীত হয় নাই। সম্ভবত ঈষৎ মাত্রায় ধাতব পদার্থ, অন্য পদার্থের কণিকা অথবা অকেলাসিত অঙ্গারক (Non-crystallised carbon) কণিকাই হীর-কের বর্ণ বিভিন্নতার কারণ হইবে। বিদ্যুৎপ্রভাবে হীরকের কতকটা স্থায়ীভাবে বর্ণ পরিবর্তন করা সম্ভব হইয়াছে। বিশেষ ভাবে রেডিয়ম (Radium)-রশ্মি বিকিরণে রাখিলে হীরককে সবুজ বর্ণ ধারণ করিতে দেখা যায়।

হীরক রঞ্জনরশ্মির (X Ray অথবা Rontgen ray) নিকট স্বচ্ছ। অতএব রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে ফটো তুলিলে হীরকখণ্ডের কোনো ফটো উঠিবে না। কাঁচ নির্মিত নকল রত্নখণ্ড রঞ্জনরশ্মির নিকট স্বচ্ছ নহে। সুতরাং রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে এইসকলের ফটো লওয়া যাইতে পারে। এইরূপ পরীক্ষায় নকল রত্ন হইতে আসল হীরকখণ্ডকে চেনা যাইতে পারে। সূর্যকিরণে অথবা রেডিয়মরশ্মি-বিকিরণে কিছুক্ষণ রাখিয়া অন্ধকারে লইয়া গেলে হীরকের অনুপ্রভা (phosphorescence) দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ উহা অন্ধকারে আলো দান করিতে থাকে। অতি বেগুনী (Ultraviolet) আলোক, রঞ্জনরশ্মি এবং বায়ুশূন্য

পাত্রে বিদ্যুৎপ্রভাব দ্বারাও হীরকের এইরূপ অনুপ্রভা দেখা যায়। বিভিন্ন হীরকখণ্ডে বিভিন্ন মাত্রায় অনুপ্রভা দেখা যায়। অনুপ্রভার সময় হীরকের কিছু বর্ণপার্থক্য দেখা যাইতে পারে।

হীরক সমআয়তন জলের তুলনায় ৩'৫২ গুণ ভারী। বিভিন্ন প্রকার হীরকের এই আপেক্ষিক গুরুত্বের (specific gravity) হ্রাস-বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ হীরকের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩'৫২, কিন্তু এই আপেক্ষিক গুরুত্বের মান ৩'১৫ হইতে ৩'৫৩ পর্যন্ত হইয়া থাকে। হীরকের গুরুত্ব মাপিবার জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার এককের (unit) প্রচলন দেখা যায়। বিদেশে হীরকের ওজন ক্যারাটে (carat) মাপা হয়। এক ক্যারাট='২০৫৩ গ্রাম=৩'২ গ্রেন (ট্রয়); কিন্তু পূর্বে এক ক্যারাটের ওজন সর্বত্র সমান ছিল না। লণ্ডনে এক ক্যারাট='২০৫৩ গ্রাম, কিন্তু আমস্টার্ডামে এক ক্যারাট='২০৫৭ গ্রাম ধরা হইত। ১৮৭১ খৃস্টাব্দে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ১ ক্যারাট='২০৫ গ্রাম মানিয়া লওয়া হয়। তখন এক ক্যারাটের কম ওজনকে ক্যারাটের ভগ্নাংশে (যেমন ১/২, ১/৪, ১/৮, ১/১৬, ১/৩২, ১/৬৪ ক্যারাট) প্রকাশ করা হইত। ১৯১৩ খৃস্টাব্দের পর হইতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক ক্যারাটের ওজন '২০০০ গ্রাম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাকে মেট্রিক ক্যারাট বলা হয়। এক ক্যারাটের কম ওজনকে বর্তমানে ক্যারাটের দশমিকে প্রকাশ করা হয় (যেমন '১, '২, মেট্রিক ক্যারাট)। ক্যারাটের শতাংশকে পয়েণ্ট (point) বলা হয়। এক মেট্রিক ক্যারাট=৩'১ গ্রেন (ট্রয়)। প্রথমাবস্থায় পৃথিবীর বৃহত্তম হীরকখণ্ড কুলিনানের (Cullinun) ওজন ছিল প্রায় ১১/৪ পাউণ্ড। ক্যারাট ছাড়া হীরককে গ্রাম (gramme), গ্রেন (grain) ও পেনিওয়েট (pennyweight-dwt) ওজনেও কখনো কখনো মাপা হয়। ১ পেনিওয়েট (ট্রয়)=

২৪ গ্রেন (ট্রয়)=১'৫৬ গ্রাম। ভারতবর্ষে রত্নাদি রতি ও মাষাতে মাপা হয়। এক রতি— এক কুঁচফলের প্রায় সমান ওজন। স্বর্ণকারের দোকানে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানভেদে আট, দশ ও বারো মাষায় এক রতি ধরা হয়। এক রতি বিলাতী মাপে ১'৮ গ্রেন (ট্রয়) ধরা হয়। মোগল যুগে মিস্কল নামে এক প্রকার মাপক স্বীকৃত ছিল। এক মিস্কল চল্লিশ রতির সমান।

রত্নের উপযোগী হীরকের মধ্যে স্বচ্ছ নীলাভ হীরক সর্বাপেক্ষা মূল্যবান, তাহার পর স্বচ্ছ বর্ণহীন হীরকের স্থান, তদনন্তর পীতাভ হীরকের সম্মান, বাদামী বর্ণের হীরকের আদর সবশেষে। উপস্থিত উৎকৃষ্ট হীরকের মূল্য প্রায় পাঁচ শত টাকা রতি। ক্রমবর্ধমান দুষ্প্রাপ্যতার জন্য হীরকের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে।

হীরক তাপ-পরিবাহক, সেজন্য স্পর্শে সাধারণত ইহাকে শীতল বলিয়া মনে হয়। তবে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা দৈহিক তাপমাত্রার অধিক হইলে হীরকখণ্ডকে উষ্ণ বলিয়া মনে হইবে। আমাদের দেশে এইরূপ অবস্থা একমাত্র গ্রীষ্মে কয়েকদিনের জন্য হইতে পারে। শীত-প্রধান দেশে এইরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। হঠাৎ তাপ দিলে অথবা হঠাৎ ঠাণ্ডা করিলে হীরকখণ্ড ফাটিয়া যায় না। রত্ন হীরকের গাত্র স্পর্শে মসৃণ ও তৈলাক্ত বোধ হয়। হীরকের বিদ্যুৎ-পরিবহন ক্ষমতা বিশেষ নাই। ঘর্ষণ দ্বারা ইহাতে ধনবিদ্যুৎ (positive electricity) উৎপন্ন হয়। হীরক ভঙ্গুর। ইহার ভঙ্গ (fracture) শাঙ্খিক (conchoidal) অর্থাৎ শঙ্খের আবরণীর অংশ অথবা পরকলার (lens) মত অংশে ইহা ভাঙিয়া থাকে।

কেলাসনের ধরন— Mode of crystallisation

হীরক সমমাত্র পদ্ধতিতে (cubic system) কেলাসিত হয়।

সমমাত্র পদ্ধতির যাবতীয় কেলাসের (crystal) বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাদের তিনটি সর্বসম অক্ষ (axis) থাকে এবং ঐ অক্ষগুলি পরস্পরের সহিত সমকোণ (right angle) উৎপন্ন করে। ২, ৩ ও ৪নং চিত্রের কেলাসের মধ্যে বিন্দুর দ্বারা এই অক্ষগুলিকে দেখানো হইয়াছে। সাধারণ লবণের দানা, চিনির দানা, ফটকিরির দানা, স্ফটিক প্রভৃতি পদার্থ
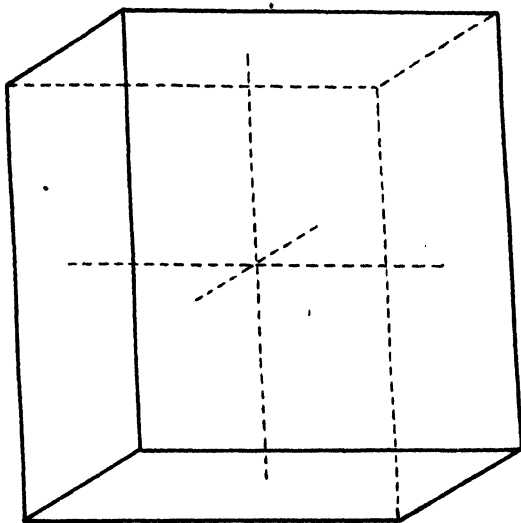
চিত্র ২। ঘনক (cube)

সমমাত্র পদ্ধতির কেলাস। কাগজপত্র চাপা দেওয়ার জন্য টেবিলের উপর যে ছয় পার্শ্বযুক্ত ঘনক (cube) ব্যবহার করা হয় (২নং চিত্র) —উহাও সমমাত্র পদ্ধতির কেলাসের একটি রূপ, যদিও উহা কৃত্রিম রাসায়নিক উপায়ে কাঁচ-নির্মিত মাত্র। অষ্টতলক (octahedron) হীরক কেলাসের স্বাভাবিক রূপ (৩নং চিত্র)। এইরূপেই প্রকৃতিতে

আমরা হীরকখণ্ডকে পাইয়া থাকি। তদ্ব্যতীত দ্বাদশ পার্শ্বক (dodecahedron) রূপেও হীরক কখনো কখনো পাওয়া যায়। (৪নং চিত্র) উপরোক্ত রূপগুলির একাধিক সংযুক্তরূপেও হীরকখণ্ডকে পাওয়া যায়। যমক (twin) রূপেও দুইটি হীরক কেলাসকে পরস্পরকে ছেদ করিয়া বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা হইতে প্রায় ১২
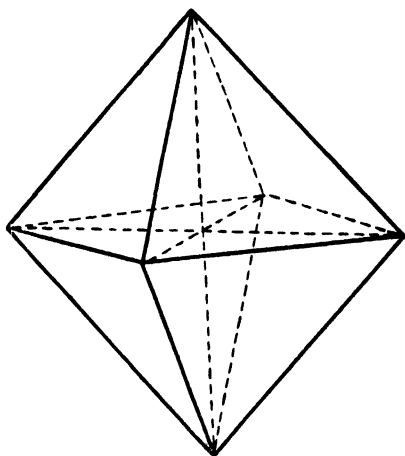
চিত্র ৩। অষ্টতলক (octahedron)

পাউণ্ডের হীরক কেলাস পাওয়া গিয়াছে। কখনো কখনো হীরক কেলাসের গাত্রে ত্রিকোণাকার গর্ত পাওয়া যায়।

স্বাভাবিক অষ্টতলক রূপের পার্শ্বগুলির সমান্তরালে হীরকের উৎকৃষ্ট সম্ভেদ (cleavage) পাওয়া যায়। অন্যান্যরূপের পার্শ্বের সমান্তরালেও সম্ভেদ পাওয়া যায়। হীরকখণ্ডকে কাটিবার সময় এই সম্ভেদতলের সাহায্য লওয়া হয়। উহাতে অল্পায়াসে ও রত্নখণ্ডের বিনা ক্ষতিতে

হীরককে কাটিতে পারা যায়। নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্যে বহুবিধরূপে হীরকখণ্ডকে কাটিয়া রত্নকে বাহির করা হয়। হীরককে হীরকখণ্ডের দ্বারাই কাটা ও পালিশ করা হয়। এই কার্যে হীরকখণ্ডের অর্ধেকের বেশি অংশ বাদ যায়। একমাত্র যঙ্কার (Jonker) নামক হীরকখণ্ডকে প্রথমবার কাটিবার সময় শতকরা ৫১ ভাগ পাওয়া গিয়াছিল।
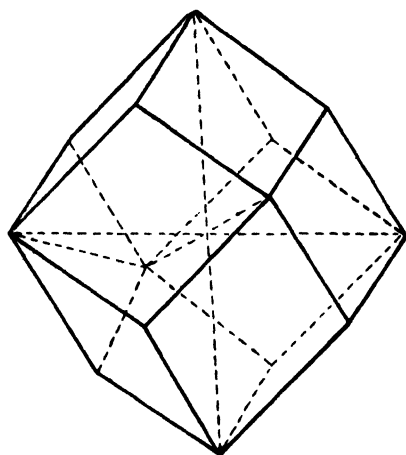
চিত্র ৪। দ্বাদশপার্শ্বক (dodecahedron)

তবে হীরকের বাদ দেওয়া অংশ ঘর্ষণাদির কার্যে ব্যবহার করা হয় বলিয়া একেবারে নষ্ট হয় না।

পুরাকালে হীরক কাটিবার পদ্ধতি জানা ছিল না, তখন যে স্বাভাবিকরূপে হীরকখণ্ডকে পাওয়া যাইত সেইরূপেই উহাকে ব্যবহার করা হইত। পরে যখন দেখা গেল যে, হীরকখণ্ডকে কাটিয়া পালিশ করিলে উহার দীপ্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় তখন হইতেই বড় বড়

হীরকখণ্ডকে কাটিয়া উহা হইতে ছোট কিন্তু অধিক মনোহর রত্ন বাহির করা হইতে লাগিল। হীরক কাটিবার কার্য ভারতে নবম শতাব্দীতে এবং ইউরোপে পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইউরোপে ১৪৫৬ খৃস্টাব্দে বেলজিয়ামের ব্রুগ্রেসের (Bruges) অধিবাসী লুই দ্য বার্কোয়েন (Louis de Berquen) সর্বপ্রথম হীরক কাটিবার ও পালিশ করিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। সম্ভবত ইউরোপে ইটালীর ভেনিসে ও ফ্রান্সে পঞ্চদশ শতাব্দীর কিছু পূর্ব হইতেই হীরক কাটা আরম্ভ হইয়াছিল। আজকাল ভারতে তত হীরক পাওয়া যায় না বলিয়া হীরক কাটিবার কার্যাদি ভারতে তত আর হয় না। তবুও দিল্লী জয়পুর প্রভৃতি স্থানে কিছু কিছু হীরক কাটা হইয়া থাকে। ইহার জন্য বেলজিয়মের অ্যাণ্টোয়ার্প, হল্যাণ্ডের আমস্টার্ডাম ও জার্মানীর হ্যানো ও ওডেনওয়াল্ড অধিক বিখ্যাত। এইসকল স্থান ব্যতীত ইটালীর জেনোয়া ও রোম, সুইজারল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউন ও জোহানেসবার্গ বোর্নিও, প্যালেস্টাইন, কিউবা, ব্রাজিল ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক হীরক কাটিবার জন্য বিখ্যাত।

প্রথমে হীরকখণ্ডকে কাটিয়া তাহার খুঁত বাদ দেওয়া হয়। অতঃপর ধীরে ধীরে যন্ত্রের সাহায্যে কাটিয়া রত্নখণ্ডকে বিভিন্ন আকার দেওয়া হয়। এইরূপে স্বাভাবিক কেলাসিতরূপ হইতে একে একে বহুপার্শ্ব-বিশিষ্ট রত্নখণ্ড কটিয়া বাহির করা হয়। আজকাল হীরকের সাধারণ কাটিবার ধরনকে ব্রিলিয়াণ্ট কাট (brilliant cut) বলে। ইহাতে হীরক কেলাসের অষ্টতলকের উপরের পিরামিডের অংশ (ইহাকে crown বলা হয়) হইতে অধিক ও নীচের পিরামিডের অংশ (ইহাকে pavilion বলা হয়) হইতে অল্প কাটিয়া বাদ দেওয়া হয়। কাটিবার পর উপরের ক্রাউন হইতে যে চ্যাপ্টা পার্শ্ব পাওয়া যায় তাহাকে টেব্‌ল্ পল্ (table

facet) বলা হয়। অনুরূপ নীচের প্যাভিলিয়ন হইতে যে পার্শ্ব পাওয়া যায় তাহাকে কিউলেট (culet) বলে। কাটিবার মাপ নির্দিষ্ট আছে। আলোকরশ্মির যাহাতে রত্নখণ্ডের মধ্যে প্রতিফলন (internal reflection) ঘটে সেইরূপভাবে উহাকে কাটা হয়। ১নং চিত্রে আলোকরশ্মির গতিপথ লক্ষ্য করিলে ইহা বোঝা যাইবে। ইহাতে রত্নখণ্ডের দীপ্তি বৃদ্ধি পায়। খুব সম্ভব এই ব্রিলিয়াণ্ট কাট পদ্ধতির হীরকখণ্ডই আমাদের দেশে 'কমল হীরক' নামে বাজারে বিক্রীত হয়, কেননা পদ্মের আকারের সহিত ব্রিলিয়াণ্ট কাট হীরকখণ্ডের সাদৃশ্য দেখা যায়। অনুরূপ 'পলকী হীরক' নামে বাজারে হীরকের চাকলা বিক্রীত হয়। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারের বলিয়া পলকী হীরকের বর্ণচ্ছটা কম ও সেজন্য মূল্যও বেশি নহে। মূল হীরকরত্ন কাটিবার পর বাদ দেওয়া অংশ হইতে পলকী হীরক বাহির করা হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রিলিয়াণ্ট কাট সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন ভিনিসীয় মণিকার পেরুজি (Peruzzi)। প্রথম অবস্থায় (ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত) ব্রিলিয়াণ্ট কাটের নাম ছিল ওল্ড মাইন কাট (Old Mine Cut)। ইহাতে মূল রত্নখণ্ডের যত কম বাদ দেওয়া সম্ভব তাহারই চেষ্টা করা হইত। পরবর্তীকালে দীপ্তির উপর প্রধানত লক্ষ্য দেওয়ায় পুরাতন কাটিবার পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করা হয়। আধুনিক ব্রিলিয়াণ্ট কাট পদ্ধতির কয়েকটি প্রকারভেদ দেখা যায়। (৫নং চিত্র)। পর্তুগীজ কাটে (Portugese Cut) রত্নের মধ্যবর্তী মেখলার উভয় পার্শ্বে দুইসারি রম্বাসের (rhombus) চতুষ্কোণ ও তিনসারি ত্রিভুজাকার পার্শ্ব কাটা হয়। ট্রাপ ব্রিলিয়াণ্ট কাটে (Trap Brilliant Cut) বিয়াল্লিশটি পার্শ্ব, লিসবন কাটে (Lisbon Cut) চুয়াত্তরটি পার্শ্ব। বিংশ শতাব্দী ব্রিলিয়াণ্ট কাটে (Twentieth

Century Brilliant Cut) আশি অথবা অষ্টাশিটি পার্শ্ব, মাল্টি ফেসেট কাটে (Multi Facet Cut) একশো চারটি পার্শ্ব কাটিয়া বাহির করা হয়। কাটিবার পর রত্নখণ্ড গোলাকার, আয়তাকার, ডিম্বাকার, ত্রিভুজাকার, উপবৃত্তাকার প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের হইতে পারে।

১৬৫৫ খৃস্টাব্দে ভিনিসীয় মণিকার বর্ঘিস (Borghis) কর্তৃক প্রচলিত রোজ কাট (Rose Cut) পদ্ধতি এখন আর তত চলে না। উহাতে একটি অনুভূমিক (horizontal) নিম্ন পার্শ্ব থাকে এবং
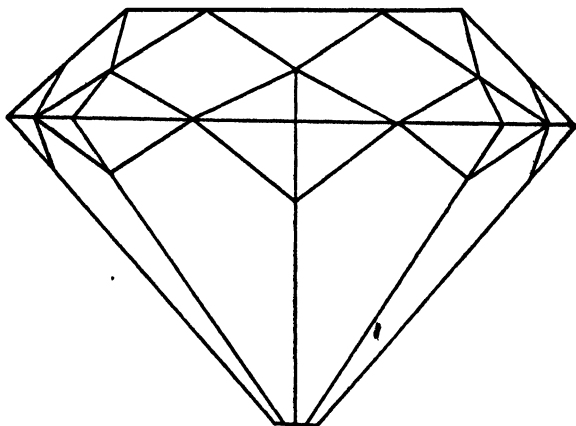
চিত্র ৫। ব্রিলিয়াণ্ট-কাট পদ্ধতিতে কাটা হীরকখণ্ড

উপরের দিকে বারো, চব্বিশ অথবা বত্রিশটি পার্শ্ব থাকে। এইরূপে কাটা রত্ন দেখিতে অনেকটা অর্ধগোলাকার। বিখ্যাত ভারতীয় হীরকরত্ন গ্রেট মোগল এইরূপে কাটা হইয়াছিল। আজকাল একমাত্র অতি ক্ষুদ্র হীরকখণ্ডই এই পদ্ধতিতে কখনো কখনো কাটা হয়।

কখনো কখনো পাতলা দুই বা তিন টুকরা হীরককে আঠাল প্রলেপে

(adhesive paste) জুড়িয়া এক বৃহত্তর রত্ন করা হয়। এইরূপে হীরকের ডাবলেট (doublet) অথবা ট্রিপলেট (triplet) তৈয়ারি করা হয়। যে তরল পদার্থের প্রতি সরাঙ্ক হীরকের প্রতি সরাঙ্কের সমান সেইরূপ পদার্থে এই শ্রেণীর রত্নকে রাখিলে মধ্যবর্তী সংযোগকারী প্রলেপের স্তর স্পষ্ট হইয়া উঠে। সাধারণত এইসকল আঠাল পদার্থ সুরাসার (alcohol) জাতীয় রাসায়নিক পদার্থে দ্রবণীয়। সুতরাং এই দ্রবণে রাখিলে ডাবলেট অথবা ট্রিপলেটের রত্নখণ্ডগুলি পৃথক হইয়া পড়িতে পারে।

রাসায়নিক গুণ— Chemical properties

বিশুদ্ধ অঙ্গারক হীরকের রাসায়নিক উপাদান। প্রধানত কয়লারও এই একই উপাদান, তবে কয়লার অঙ্গারক অকেলাসিত (non-crystallised) ও অবিশুদ্ধ। কোনো কোনো শিলার মণিক-পদার্থে যে অঙ্গারক থাকে উহা কখনো কখনো ভূ-আলোড়নে অথবা অন্য কোনো প্রাকৃতিক উপায়ে অত্যধিক চাপ ও তাপের প্রভাবে কেলাসিত অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। তখন হীরকের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

অঙ্গারককে উত্তাপে দগ্ধ করিলে কার্বন-ডাইঅক্সাইড (Carbon dioxide) গ্যাস পাওয়া যায়। হীরককেও দগ্ধ করিলে ঐ গ্যাস পাওয়া যায়। হীরকের এই পরিবর্তনের জন্য অক্সিজেন পরিবেশে ৮৫০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (centigrade) তাপমাত্রার প্রয়োজন। অক্সিজেনের পরিমাণ কম হইলে আরও অধিক তাপের প্রয়োজন। বায়ুর সংস্পর্শ ভিন্ন ১৯০০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় উত্তাপ দিলে হীরক গ্রাফাইটে পরিবর্তিত হয়। হীরককে দগ্ধ করিলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, কিন্তু কার্বনেডো জাতীয় কৃষ্ণ হীরককে দগ্ধ করিলে কিঞ্চিৎ ভস্ম পাওয়া যায়। তাপ

দ্বারা হীরককে গলানো সম্ভব হয় নাই। হীরক কোনো অ্যাসিডে দ্রবণীয় নহে কিন্তু পটাশিয়াম বাইক্রোমেট (Potassium bichromate) ও সালফিউরিক অ্যাসিডের (Sulphuric acid) সাহায্যে হীরক কার্বন-ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে। ক্ষার (alkali) পদার্থের হীরকের উপর কোনো প্রতিক্রিয়া নাই।

হীরকের বিষাক্ত পদার্থ হিসাবে যে প্রবাদ চলিত উহা একেবারেই অসত্য।

হীরককে সাধারণত মূল উৎপাদক শিলায় পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই হীরকখণ্ডকে নদীতীরে উপল ও বালুকণার সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই অবস্থায় হীরককে পোখরাজ (Topaz), সৌগন্ধিক (Spinel), গোমেদ (Zircon), তামড়ি (Garnet), টুরমেলিন (Tourmaline), ম্যাগনেটাইট (Magnetite) রুটাইল (Rutile) প্রভৃতি মণিক ও স্বর্ণ এবং প্লাটিনাম (Platinum) প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুর সহিত একত্রে পাওয়া যায়। কখনো কখনো পূর্বতন উপল ও বালুকণার দ্বারা সৃষ্ট কংগ্লোমারেট (Conglomerate) নামক শিলায় হীরককে প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া যায়। ভারতের অধিকাংশ হীরকই এই জাতীয় শিলায় পাওয়া গিয়াছে। হীরকের মূল উৎপত্তি আগ্নেয় শিলায় হইয়া থাকে। রত্নধর শিলা যখন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে বিচূর্ণ ও বিজীর্ণ হইয়া যায় তখন হীরক মূল শিলা হইতে পৃথক হইয়া যায় ও নদী বা জলস্রোতে অন্যত্র বাহিত হইয়া থাকে। আগ্নেয়গিরির নলের (Volcanic pipe) শিলায় অনেক সময় হীরক-খণ্ড পাওয়া যায়। দক্ষিণ-আফ্রিকার হীরকের খনিতে হীরকের এই প্রকার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-আফ্রিকার খনিগুলির রত্নধর শিলার নাম কিম্বার্লাইট (Kimberlite)। ঐ শিলা ভূ-পৃষ্ঠের

নিম্নের সুগভীর অঞ্চল হইতে উদ্গীর্ণ হইয়াছিল। উপরের দিকে উহা বায়ুমণ্ডলের প্রতিক্রিয়ায় কতকটা পরিবর্তিত হইয়া প্রথমে 'নীলমৃত্তিকা' (Blue Ground) ও আরও উপরে ভূ-পৃষ্ঠের নিকট 'পীত মৃত্তিকা' (Yellow Ground) এর সৃষ্টি করিয়াছে। এই উভয়বিধ মৃত্তিকায় ও নদীর পললে হীরকখণ্ড পাওয়া যায়। বর্তমানে গর্ত করিয়া নীল মৃত্তিকার কাজ চলিতেছে। কিম্বার্লি খনির গভীরতা ৩৬০০ ফুটের অধিক পৌঁছিয়াছে। শিলার যে পরিবেশে হীরকের কেলাসন ঘটে উহা গ্যাসের প্রভাবে অনেকটা নমনীয় হইয়া পড়ে। অতঃপর ধীরে ধীরে শিলা-মধ্যস্থ জৈব পদার্থের অঙ্গারকের কেলাসন ঘটিয়া থাকে। উহাতে হীরকখণ্ডের উৎপত্তি হয়। উল্কাপিণ্ড ও কয়েক প্রকার ইস্পাতের মধ্যে হীরকের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে।

অধিক মূল্য ও চাহিদার জন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সংশ্লিষ্ট অথবা ঘটিত (Synthetic) হীরক প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ১৮৮০ খৃস্টাব্দে হ্যানে (Hannay) নামক একজন রসায়নবিদ্ কয়েকটি সংশ্লিষ্ট হীরক-কণিকা ব্রিটিশ মিউজিয়মে পাঠান। ব্যানিস্টার (Bannister) ও লন্সডেল (Lonsdale) পরে এইগুলিকে প্রকৃত হীরক-কণিকা বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক হেনরি ম্যঁয়সা (Henri Moissan) চিনি হইতে উৎপন্ন বিশুদ্ধ অঙ্গারককে গলিত লোহার সহিত ৪০০০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় মেলান। এই অবস্থায় গলিত লোহার সহিত কিছু পরিমাণ অঙ্গারক মিলিয়া যায়। তারপর ঐ গলিত দ্রবণকে জলে ফেলিয়া সহসা ঠাণ্ডা করা হয়। উহার ফলে উদ্ভূত অত্যধিক চাপের প্রভাবে লোহার মিশ্রিত অঙ্গারক কেলাসিত হইয়া হীরক-কণিকার সৃষ্টি করে। অতঃপর এই লোহাকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (Hydrochloric acid) ও নাইটিক

অ্যাসিড (Nitric acid) দ্বারা বিজীর্ণ করা হয়। পরিশেষে যে পদার্থ পাওয়া যায় তাহাতে গ্রাফাইট, কৃষ্ণবর্ণের হীরক ও কয়েকটি স্বচ্ছ উজ্জ্বল কণিকা পাওয়া যায়। ম্ঁয়সা এই উজ্জ্বল কণিকাগুলিকে হীরক-কণিকা মনে করিয়াছিলেন। অনেকে ঐগুলিকে সিলিকন কার্বাইড (Silicon carbride) নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ বলিয়া মনে করেন। ১৯০৬ খৃস্টাব্দে নোবল্ (Sir Andrew Noble) ও ক্রুক্স (Sir William Crookes) বিস্ফোরক পদার্থের পরীক্ষায় হীরক-প্রস্তুতির সম্ভাবনা দেখিতে পান। ইস্পাতের চোঙায় কর্ডাইট (Cordite) নামক বিস্ফোরক পদার্থে অঙ্গারকের অংশ বৃদ্ধি করিয়া উহার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। উহাতে চোঙার মধ্যে তাপমাত্রা ৫১০০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ও চাপমাত্রা প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে পঞ্চাশ টন পর্যন্ত পৌছায়। এই অত্যধিক তাপ ও চাপের প্রভাবে অঙ্গারককে হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল কণিকায় কেলাসিত হইতে দেখা যায়। এইরূপে প্রাপ্ত তথাকথিত হীরকখণ্ড বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। কারণ দেখা গিয়াছে যে, এইসকল ঘটিত হীরক-কণিকার যথাযোগ্য প্রতিসরাঙ্ক ও আণবিক সংগঠন (atomic structure) নাই। পূর্বে বলা হইয়াছে যে কোনো কোনো প্রকারের ইস্পাতে হীরক-কণিকার অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, ঘটিত হীরক প্রস্তুত করা একেবারে অসম্ভব নাও হইতে পারে। তবে আজ পর্যন্ত রাসায়নিক উপায়ে যে তথাকথিত হীরক-কণিকা পাওয়া গিয়াছে তাহারা প্রকৃত হীরক হইলেও এত ক্ষুদ্র যে বিশেষ কোনো কাজে লাগানো সম্ভবপর হয় নাই। সেজন্য হীরকের ক্ষেত্রে (বিশেষ রত্নের বিষয়ে) বলা যাইতে পারে যে বাজারে ঘটিত হীরক পাওয়া যায় না। যাহা আছে উহা প্রকৃতিজ হীরকখণ্ড অথবা হীরকের সমধর্মী অন্য কোনো পদার্থ।

উল্কাপিণ্ডের পদার্থের মধ্যে কখনো কখনো হীরক-কণিকা পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকার ও যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনার (Arizona) অন্তর্গত ক্যানন ডায়াব্লো (Canon Diablo) নামক স্থানে পতিত লৌহ উল্কাপিণ্ডের পদার্থে হীরকের অস্তিত্ব সত্যই পাওয়া গিয়াছে। রাশিয়ার পেঞ্জা (Penza) নামক স্থানের অন্তর্গত নোভো উরেই (Novo Urei) এবং চিলির কর্কোট (Corcote) নামক স্থানে পতিত শিলা উল্কাপিণ্ডের পদার্থেও হীরকখণ্ডের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। (উল্কাপিণ্ড —Meteorite, প্রধানত দুই প্রকারের হইয়া থাকে : লৌহ উল্কাপিণ্ড — Iron meteorite ও শিলা উল্কাপিণ্ড— Stone meteorite)। উল্কাপিণ্ডের পদার্থে প্রাপ্ত হীরকগুলির বর্ণ ঈষৎ ধূসর বা কৃষ্ণ।

হীরক প্রধানত দুই প্রকারের হইয়া থাকে : (১) যাহা রত্ন হিসাবে ব্যবহৃত হয় ; ইহার মূল্য অধিক ও ইহাতে রত্নের উপযুক্ত গুণ থাকা দরকার। (২) রত্নব্যতীত অন্যান্য কার্যে যেসকল হীরক ব্যবহৃত হয় ; রত্নের উপযোগী ইহার সকলগুণ না থাকায় রত্ন হিসাবে ইহাদের আদর নাই, কিন্তু কঠোরতা গুণের জন্যই উহাদের ব্যবহার হয়। এইসকল ব্যবহারের উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। দ্বিতীয়শ্রেণীর হীরকের মধ্যে আছে অপ্রীতিকর বর্ণবিশিষ্ট হীরক, বিশেষ করিয়া ধূসর বর্ণের বোর্ট, কৃষ্ণ বর্ণের কার্বনেডো ও গোল গোল বালাস (ballas)।

বাৎসরিক সংগৃহীত হীরকের প্রায় $\frac{৩}{৪}$ অংশ (মূল্যে কিন্তু $\frac{১}{৪}$ অংশ মাত্র) শিল্পাদির কার্যে ব্যবহৃত হয় ও বাকী অংশ রত্ন হিসাবে বিক্রীত হয়। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে হীরকের ব্যবহার আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। হীরক লইয়া বহু গবেষণাও চলিতেছে। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক শ্রীচন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমনের হীরক বিষয়ে গবেষণা বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

আসল ও নকল হীরক

হীরক ক্রয়কালে অজ্ঞতাবশত অনেককেই অনেক সময় প্রতারিত হইতে হয়। এজন্য নকল পদার্থ হইতে আসল হীরককে চিনিয়া লইবার বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হইতেছে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চুনি ও নীলার মত ঘটিত হীরক আজও বাজারে বাহির হয় নাই।

হীরকখণ্ডের সহিত সাধারণত শ্বেত গোমেদ (White Zircon), শ্বেত কুরুবিন্দ (White Corundum—প্রধানতঃ ঘটিত), পোখরাজ (Topaz), বিশেষ প্রকার কাঁচ (Paste অথবা Strass বলে), স্ফটিক (Rock crystal), সৌগন্ধিক (ঘটিত) এবং রুটাইল (ঘটিত)—ইহাদেরই ভ্রম হইতে পারে। এইগুলির সহিত পূর্বোক্ত ডাবলেট অথবা ট্রিপলেট হীরকখণ্ডকেও ধরিতে হইবে, কারণ ইহা দ্বারাও প্রকৃত হীরকের নামে ক্রেতাকে প্রতারিত করা যাইতে পারে।

হীরকের দ্যুতি, বর্ণবৈচিত্র্য, কঠোরতা, অনুপ্রভা, আপেক্ষিক গুরুত্ব ও প্রতিসরাঙ্ক পরীক্ষা করিলে ইহার বৈশিষ্ট্য অনায়াসেই ধরা পড়ে। তাহা ছাড়া পূর্বোক্ত রঞ্জনরশ্মির পরীক্ষা হীরকরত্ন চিনিবার একটি উপায়।

রত্নখণ্ডকে লইয়া নিম্নলিখিত পরীক্ষা করা উচিত।

১। ইহার হৈরিকদ্যুতি (adamantine lustre) আছে কিনা, অর্থাৎ ইহা বিশেষভাবে দীপ্তিমান কিনা।

২। ইহার কঠোরতা Mohs এর মাপনীতে ১০ কিনা, এক টুকরা ঘটিত চুনি অথবা নীলার উপর ইহার সাহায্যে দাগ কাটিলে করকর শব্দ শোনা যাইবে এবং চুনির (বা নীলার) উপর দাগ কাটা হইবে। এই কাটাদাগ বিবর্ধক পরকলার (magnifying

lens) সাহায্যে দেখিলে আরও প্রকট মনে হইবে। Mohs-এর মাপনীতে চুনি বা নীলার কঠোরতা কম— ৯ মাত্র।

৩। ইহার রামধনুর বর্ণবৈচিত্র্য (rainbow flash) ও আগুনের ঝলকানি (fire) আছে কি না।

৪। ইহার পার্শ্ব বিশেষ ভাবে মসৃণ কিনা।

৫। ইহার মধ্যে আলোকরশ্মির পুরা প্রতিফলন হয় কিনা। রত্নখণ্ডের টেব্‌ল্ পল্‌কে কোনো আলোক উৎসের সম্মুখে ধরিলে পশ্চাতের কোনো আলোক প্রায় দেখা যাইবে না।

৬। ইহার প্রতিসরাঙ্ক অধিক কিনা। প্রতিসরাঙ্ক নির্ণয়ের জন্য কতকগুলি তরল পদার্থের প্রস্ত (set) পাওয়া যায়। উহাতে ডুবাইয়া প্রতিসরাঙ্ক (প্রকৃত কিম্বা আপেক্ষিক) নির্ণয় করা যাইতে পারে। প্রতিসরাঙ্ক-মানযন্ত্রের (refractometer) সাহায্যেও উহা নির্ণয় করা যায়। তবে এ বিষয়ে অসুবিধা এই যে, রত্নখণ্ড ও ঐ যন্ত্রের মধ্যে ঠিকমত সংযোগ না হওয়ার জন্য প্রকৃত প্রতিসরাঙ্ক পাওয়া যায় না। তবুও উহা হইতে যে ফল পাওয়া যায় তাহা দ্বারা হীরককে সনাক্ত করা সম্ভব। হীরকখণ্ডের উপর পার্শ্বে লক্ষ্য করিলে মনে হইবে যে অপর দিকের পার্শ্ব যেন উঁচু।

৭। সূর্যালোক, রঞ্জনরশ্মি, অতি বেগুনী আলো প্রভৃতির সাহায্যে রত্নখণ্ডের অনুপ্রভা পাওয়া যায় কিনা। হীরকের অনুপ্রভা প্রসিদ্ধ।

৮। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩·৫২ কিনা। আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ক তরল পদার্থের প্রস্ত পাওয়া যায়। তাহাতে ডুবাইয়া ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা যাইতে পারে। যে

তরল পদার্থের মধ্যে নিমজ্জিত অবস্থায় রত্নখণ্ড ভাসিতে থাকিবে তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং রত্নখণ্ডের আপেক্ষিক গুরুত্ব একই হইবে।

৯। রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে ফটো তুলিলে ইহাকে স্বচ্ছ দেখায় কিনা। হীরক রঞ্জনরশ্মির নিকট স্বচ্ছ। অতএব হীরক-খণ্ডের কোনো ফটো রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে পাওয়া যাইবে না।

১০। শিলা বা মণিকের পরীক্ষার জন্য যে বিশেষ প্রকারের অণুবীক্ষণ যন্ত্র (microscope) পাওয়া যায় উহার নিকল (nicol) নামক অংশ দুইটি তির্যক (crossed) করিয়া হীরককে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে হীরকসহ সমগ্র দৃশ্যক্ষেত্রই কৃষ্ণ বর্ণ হইয়াছে। অণুবীক্ষণের দৃশ্যমঞ্চটিকে (microscopic stage) সম্পূর্ণ একবার ঘুরাইয়া দিলেও হীরককে কৃষ্ণ বর্ণেরই দেখাইবে।

১১। হীরকের দ্বিপ্রতিসরণ (double refraction) নাই। বিবর্ধক পরকলার সাহায্যে হীরক রত্নখণ্ডের উপর-পার্শ্বের মধ্য দিয়া নীচের পার্শ্বগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে দুইটি পার্শ্বের মধ্যবর্তী কোনো রেখার দ্বিত্বভাব মনে হয় না— একটি রেখা বলিয়াই মনে হয়। যেসকল মণিকের দ্বিপ্রতিসরণ আছে তাহাদের ক্ষেত্রে এইরূপ পরীক্ষায় ঐ রেখাকে দুইটি রেখা বলিয়া মনে হইবে।

কোনো-না-কোনো বিষয়ে পূর্বোক্ত ছয়টি মণিক (শ্বেত গোমেদ—ঘটিত রুটাইল) হীরকের সমতুল্য হইলেও সকল পরীক্ষা করা হইলে আসল হীরকের আপন বৈশিষ্ট্য প্রকট হইয়া পড়ে ও প্রকৃত হীরককে নকল রত্ন হইতে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে।

১. হীরক ও শ্বেত গোমেদ

নিকটগুণ—

(১) উভয়ই সমবর্ণের ও স্বচ্ছ হইতে পারে।

(২) মসৃণতা প্রায় এক হইতে পারে।

(৩) বর্ণবৈচিত্র্য ও আলোর ঝলকানি উভয়েরই থাকিতে পারে।

(৪) সাধারণ প্রতিসরাঙ্ক-মানযন্ত্রে হীরকের প্রতিসরাঙ্ক ১·৮ পাওয়া যাইবে। ইহার কারণ উপযুক্ত মাধ্যমের অভাবে যন্ত্র ও রত্নখণ্ডের মধ্যে প্রকৃত সংযোগ হয় না। শ্বেত গোমেদের প্রতিসরাঙ্ক ১·৯-এর অধিক হওয়ায় উভয়ের মধ্যে প্রতিসরাঙ্ক বিষয়ে ভ্রম হইতে পারে। উভয়ই বিশেষ দীপ্তিমান।

এইসকল আপাত সাদৃশ্যের জন্য সিংহল হইতে প্রাপ্ত শ্বেত গোমেদকে মাতুরা বা মাতারা হীরক বলা হয়।

পার্থক্য—

(১) হীরকের কঠোরতা অধিক— ১০, গোমেদের কম— ৭½।

(২) হীরকের আপেক্ষিক গুরুত্ব কম; হীরকের ৩·৫২, গোমেদের ৪·৬৯।

(৩) হীরকের প্রতিসরাঙ্ক ২·৪২, গোমেদের ১·৯৩ হইতে ১·৯৯। উপযুক্ত তরল মাধ্যমে ডুবাইয়া এই প্রতিসরাঙ্কের পার্থক্য প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে।

(৪) হীরকের দ্বিপ্রতিসরণ নাই, গোমেদের আছে।

(৫) রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে পরীক্ষা। এই রশ্মিতে হীরক স্বচ্ছ, গোমেদ স্বচ্ছ নহে।

২. হীরক ও শ্বেত কুরুবিন্দ

নিকট গুণ—

(১) উভয়ই সমবর্ণের ও স্বচ্ছ হইতে পারে।

(২) উভয়ই বেশ উজ্জ্বল।

(৩) উভয়ের পার্শ্বই বেশ মসৃণ হইতে পারে।

(৪) উভয়ই বেশ কঠোর।

পার্থক্য—

(১) হীরকের দীপ্তি কুরুবিন্দের অপেক্ষা বেশি।

(২) হীরকের প্রতিসরাঙ্ক অধিক। হীরকের ২'৪২, কুরুবিন্দের ১'৭৬।

(৩) হীরকের ন্যায় কুরুবিন্দের আলোর ঝলকানি ও বর্ণবৈচিত্র্য নাই।

(৪) হীরকের দ্বিপ্রতিসরণ নাই, কুরুবিন্দের আছে।

(৫) হীরকের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩'৫২, কুরুবিন্দের ৩'৯৯।

(৬) হীরকের কঠোরতা ১০, কুরুবিন্দের ৯।

শ্বেত কুরুবিন্দ সাধারণত প্রকৃতিজ হয় না। ইহাকে রাসায়নিক উপায়ে ঘটিত অবস্থায় প্রস্তুত করা হয়। ঘটিত কুরুবিন্দে বক্ররেখা, বুদ্বুদ প্রভৃতি বিবর্ধক পরকলার সাহায্যে দেখা যাইতে পারে। হীরককে ঘটিত অবস্থায় পাওয়া যায় না বলিয়া এইসকল দ্বারাও হীরককে পৃথক করা যাইতে পারে।

৩. হীরক ও পোখরাজ

নিকটগুণ—

(১) উভয়ই স্বচ্ছ ও প্রায় সমবর্ণের হইতে পারে।

(২) উভয়ই বেশ উজ্জ্বল ও মসৃণ গাত্রযুক্ত হইতে পারে।

(৩) উভয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিকটবর্তী—হীরকের ৩'৫২, পোখরাজের ৩'৫৬।

পার্থক্য—

(১) পোখরাজ প্রায় সময়ই ঈষৎ পীতবর্ণের হইয়া থাকে।

(২) পোখরাজের দীপ্তি কম।

(৩) হীরকের প্রতিসরাঙ্ক ২·৪২, পোখরাজের ১·৬৩।

(৪) পোখরাজে বর্ণবৈচিত্র্য ও আলোর ঝলকানি পাওয়া যায় না।

(৫) হীরকের কঠোরতা ১০, পোখরাজের ৮।

(৬) হীরকের দ্বিপ্রতিসরণ নাই, পোখরাজের আছে।

৪. হীরক ও কাঁচ

নিকটগুণ—

(১) উভয়ই সমবর্ণের ও স্বচ্ছ হইতে পারে।

(২) সীসকমিশ্রিত কাঁচখণ্ড আলোর ঝলকানি দেখাইতে পারে।

(৩) কাঁচের আপেক্ষিক গুরুত্ব হীরকের সমান করা যাইতে পারে।

(৪) উভয়েরই দ্বিপ্রতিসরণ নাই।

পার্থক্য—

(১) হীরকের কঠোরতা ১০, কাচের ৫½।

(২) হীরকের দীপ্তি বেশি।

(৩) কাঁচখণ্ড— তত মসৃণ নহে। বিশেষ করিয়া কিছু পুরাতন হইলে বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণার সংঘাতে কাঁচ অমসৃণ হইয়া পড়ে।

(৪) অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে কাঁচের মধ্যে কখনো কখনো বুদ্বুদ দেখিতে পাওয়া যায়।

(৫) রঞ্জনরশ্মির নিকট হীরক স্বচ্ছ, কিন্তু কাঁচ তাহা নহে।

(৬) কাঁচখণ্ড স্পর্শে হীরক অপেক্ষা কম শীতল মনে হইবে।

৫. হীরক ও স্ফটিক

নিকটগুণ—

(১) উভয়ই সমবর্ণের ও স্বচ্ছ হইতে পারে।

পার্থক্য—

(১) হীরকের কঠোরতা ১০, স্ফটিকের ৭।

(২) স্ফটিকের দীপ্তি হীরকের অপেক্ষা কম।

(৩) হীরকের প্রতিসরাঙ্ক ২.৪২, স্ফটিকের ১.৫৫।

(৪) হীরকের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩.৫২, স্ফটিকের ২.৬৫।

(৫) হীরকের বর্ণবৈচিত্র্য ও আলোর ঝলকানি স্ফটিকে নাই।

৬. হীরক ও শ্বেত সৌগন্ধিক (ঘটিত)

নিকটগুণ—

(১) উভয়ই সমবর্ণের ও স্বচ্ছ হইতে পারে।

(২) উভয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব যথেষ্ট অধিক।

(৩) উভয়ের দ্বিপ্রতিসরণ নাই।

(৪) উভয়ের আলোর ঝলকানি থাকিতে পারে।

পার্থক্য—

(১) হীরকের কঠোরতা ১০, সৌগন্ধিকের ৮।

(২) উহাদের প্রতিসরাঙ্ক পৃথক। হীরকের ২.৪২, সৌগন্ধিকের ১.৭২।

(৩) হীরকের দীপ্তি অধিক।

(৪) হীরকের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩.৫২, সৌগন্ধিকের ৩.৬৩।

(৫) ঘটিত সৌগন্ধিকে বুদ্বুদ ও বক্ররেখা পাওয়া যাইতে পারে। হীরকে তাহার সম্ভাবনা নাই।

৭. হীরকও রুটাইল

নিকট গুণ—

(১) ঘটিত রুটাইল হীরকের ন্যায় স্বচ্ছ ও বর্ণহীন হইতে পারে।

(২) রুটাইলে হীরকের মত দ্যুতি থাকিতে পারে। এই সাদৃশ্যের

জন্য ঘটিত রুটাইলকে রাসায়নিক হীরক (chemical diamond) বলা হয়।

পার্থক্য—

(১) হীরকের কঠোরতা ১০, রুটাইলের ৬ হইতে ৬½।

(২) রুটাইলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৪.২, হীরকের ৩.৫২।

(৩) রুটাইলের প্রতিসরাঙ্ক ২.৬ হইতে ২.৯১, হীরকের ২.৪২।

(৪) রঞ্জনরশ্মির পরীক্ষায় হীরক স্বচ্ছ, রুটাইল তাহা নহে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত হীরক প্রধানত ভারতবর্ষ হইতেই পাওয়া যাইত। সামান্য কিছু বোর্নিও (প্রধানত পণ্টিয়ানক Pantianak শহর) হইতে আসিত। ভারতীয় হীরক শিল্প আনুমানিক খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ১৭২১ খৃস্টাব্দে ব্রাজিলে হীরক আবিষ্কার হইবার পর হইতেই ভারতীয় হীরক শিল্পের বিশেষ ক্ষতি হয়। দক্ষিণ-আফ্রিকায় হীরক ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতীয় হীরক শিল্প কোনোক্রমে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত জীবিত ছিল। বর্তমানে পৃথিবীর হীরকের শতকরা ৯৫ ভাগ দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে আসিয়া থাকে। ভারতবর্ষে এখন আর তত হীরক উত্তোলিত ও সংগৃহীত হয় না। বর্তমানে সমগ্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে সংগৃহীত হীরকের মূল্য এক লক্ষ টাকার কম হইবে, কিন্তু বাহির হইতে আমদানী করা হীরকের মূল্য এক কোটি টাকার অধিক।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, শুক্রনীতি, বৃহৎসংহিতা, গরুড়পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে হীরক ও অন্যান্য রত্নাদির বিষয়ে উল্লেখ আছে। তাহা ছাড়া জ্যোতিষশাস্ত্রে ও আয়ুর্বেদেও হীরকের উল্লেখ আছে। বিদেশে গ্রীক থিওফ্রেস্টাস (Theophrastus), রোমক সলিনাস (Solinus), প্লিনি (Pliny) প্রভৃতির লেখায় রত্নাদির বিষয়ে উল্লেখ

দেখা যায়। প্লিনির হিস্টরিয়া নেচারালিস (Historia Naturalis) গ্রন্থে যে ব্রিস্টল হীরক (Bristol Diamond) বা বাক্সটন হীরক (Buxton Diamond) -এর উল্লেখ আছে উহা প্রকৃত পক্ষে স্ফটিক। দ্বাদশ শতাব্দীতে লেখা মহম্মদ বিন মনসুরের রচিত রত্নবিষয়ে একটা পুস্তক দেখা যায়। প্রায় সকল দেশেই রত্নাদির ব্যবহারের বহু পুরাতন উল্লেখ ও নিদর্শন পাওয়া যায়।

ভারতে পৌরাণিক গল্প প্রচলিত আছে যে, রাক্ষসরাজ রাবণের রাজধানী লঙ্কার উপর দিয়া গমন কালে এক দৈত্যকে রাবণ ক্রোধবশত অস্ত্রাঘাতে হত্যা করেন। বহু অংশে কর্তিত হইয়া এই দৈত্যের দেহ রাবণগঙ্গা নামক নদীতে নিক্ষিপ্ত হয়। এই দৈত্যের দেহাংশ হইতে রত্নাদির উৎপত্তি হইয়াছে। তাহার অস্থি হইতে হীরক, রক্তবিন্দু হইতে চুনি, সবুজ পিত্তাশয় হইতে পান্না ও শুভ্রদন্ত হইতে মুক্তার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দক্ষিণ-ভারতের রাবণগঙ্গার তীরবর্তী রত্নপুরম্ নামক স্থানটি কয়েক প্রকার রত্ন ও উপরত্নের জন্য বিখ্যাত এবং রত্নাদির প্রাপ্তিস্থান বলিয়াই এই স্থানের নাম রত্নপুরম্ হইয়াছে।

বিদেশীদের মধ্যে ভারতীয় হীরকশিল্পের বিবরণ সর্বপ্রথম পর্তুগীজ গার্সিয়া দ্য ওর্টা (Garcia de Orta) ১৫৬৫ খৃস্টাব্দে প্রদান করেন। বিখ্যাত ফরাসী পরিব্রাজক, মণিকার ও বণিক টাভার্নিয়ে (Tavernier) ভারতীয় হীরক সম্পদের এক গৌরবময় বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৬৩৮ হইতে ১৬৬৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে থাকিয়া এই বিবরণ লিখিয়া যান।

ভারতবর্ষে হীরক সাধারণত নদীতীরবর্তী স্থানেই পাওয়া যায়। দক্ষিণ-ভারতের পেন্নার নদীর তীরে কুদ্দাপা, কৃষ্ণা নদীর তীরে কর্নুল ও

কোলার এবং উড়িষ্যায় মহানদীর তীরে সম্বলপুর ও বুন্দেলখণ্ডের পান্না নামক স্থানে হীরক পাওয়া যাইত। বিহারের পালামৌ জেলায় শঙ্খ ও কোয়েল নদীর বালুতে, মহীশূরের অনন্তপুর, মাদ্রাজের বেলারি প্রভৃতি স্থানে হীরক পাওয়া যাইত। মধ্যভারতে পান্নার নামকরা খনি শহিদান। পান্না ছাড়া মধ্যভারতে চারখড়ি, বিজাওয়ার, কোঠি, পাথার, কাছার, অজয়গড়, বরমুণ্ডা, প্রভৃতি স্থানগুলি হইতে হীরক পাওয়া যাইত। দক্ষিণ-ভারতে হীরক ব্যবসায়ের কেন্দ্র ছিল গোলকুণ্ডা। দক্ষিণ-ভারত হইতে কয়েকটি জগদ্বিখ্যাত হীরকখণ্ড পাওয়া গিয়াছে। পান্নার হীরক দক্ষিণ-আফ্রিকার হীরক হইতে দীপ্তিতে অধিক উজ্জ্বল। ভারতে এইসকল স্থানে আজকাল আর তত হীরক পাওয়া যায় না। দক্ষিণ-ভারতের ও মধ্যপ্রদেশের হীরকপ্রাপ্তিস্থানগুলিতে আজকাল আর বিশেষ কাজ হয় না। তবুও প্রবল বারিবর্ষণের পর নদীর বালুতে হীরকখণ্ড কখনো কখনো জলস্রোতে বাহিত হইয়া আসে।

ভারতের বিন্ধ্য যুগের শিলার (Vindhyan rocks) অন্তর্গত কংগ্লোমারেট (conglomerate) জাতীয় শিলার মধ্যে হীরকখণ্ডগুলিকে প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া যায়। বনগণপল্লী দক্ষিণ-ভারতে হীরকবাহী শিলাস্তর। বনগণপল্লীর স্তর ও বিন্ধ্যযুগের শিলা সমসাময়িক। মধ্য-ভারতের হীরক-খনিগুলি বিন্ধ্যপর্বতের শিলাঞ্চলে অবস্থিত। উহার অন্তবর্তী কংগ্লোমারেট শিলা হইতে হীরকখণ্ড সংগৃহীত হয়। দক্ষিণ-ভারতের অনন্তপুর জেলার অন্তর্গত বজ্রকারুর নামক স্থানে হীরককে মূল আগ্নেয় শিলায় পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণ-আফ্রিকার কিম্বার্লাইট শিলার সহিত উহার আপাত সাদৃশ্য থাকিলেও উহারা বিভিন্ন প্রকারের শিলা। পান্না অঞ্চলে মাজগাওয়ান নামক স্থানে একটি শিলানলের (rock pipe) অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে।

পান্না অঞ্চলে আজও কিছু কিছু হীরক সংগ্রহের কাজ হইয়া থাকে। পূর্বের ন্যায় এখনও এই স্থানে প্রধানত অত্যন্ত পুরাতন পদ্ধতিতেই কাজ হইয়া থাকে। পান্না অঞ্চলের কংগ্লোমারেট শিলাকে স্থানীয় ভাষায় মুড্ডা বলে। এই শিলাকে খুঁজিতে গিয়া স্থানে স্থানে একটি গর্ত করিতে হয়। এই গর্তগুলির ব্যাস ১৫ হইতে ৪০ ফুট এবং গভীরতা প্রায় ৭০ ফুট পর্যন্ত হইয়া থাকে। মুড্ডার শিলা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া উহা খনন করা অত্যন্ত দুরূহ। সেজন্য প্রথমে ঐ শিলার স্তরের পর কাষ্ঠখণ্ড রাখিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। এই প্রকারে তাপের পরিবর্তন দ্বারা শিলার মধ্যে ফাটল ধরানো হয়। পরে ঐসকল ফাটল ধরিয়া শিলাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এইরূপে প্রাপ্ত শিলাখণ্ডগুলিকে খনি হইতে উপরে উঠাইয়া আনিয়া ছোট ছোট গর্তের মধ্যে স্তূপীকৃত করা হয়। পরে এই স্তূপের উপর ক্রমাগত পিটাইয়া শিলাখণ্ডগুলিকে আবশ্যক-মত ক্ষুদ্রাকারে আনা হয়। অতঃপর এইগুলিকে বাঁধানো গর্তে ফেলিয়া জল দ্বারা ধৌত করা হয়। বিভিন্ন গর্তে কয়েকবার ধৌত করিয়া যখন মুড্ডার শিলা সম্পূর্ণরূপে মৃত্তিকাশূন্য হইয়া উঠে তখন এইগুলিকে পরিষ্কার জমির উপর রাখিয়া উহা হইতে হীরকখণ্ড খুঁজিয়া বাহির করা হয়। একবার হীরকসংগ্রহের পর পুনরায় ঐ শিলা খণ্ডগুলিকে বিছাইয়া হীরক সংগ্রহ করা হয়। অতঃপর বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও দালাল মারফত ঐগুলি বিদেশে কাটিবার ও পালিশ করিবার জন্য পাঠানো হয়।

বর্তমানে পান্নাতে Panna Diamond Mining Syndicate Ltd নামক একটি হীরকব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি দক্ষিণ-আফ্রিকার ধরনে যন্ত্রপাতির সাহায্যে আধুনিক প্রক্রিয়ায় কাজ শুরু করিয়াছে। সম্প্রতি (১৯৫৪ সালে) তিনজন রুশ বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞরূপে পান্নার এইসকল স্থান দেখিয়া গিয়াছেন

ও হীরকসংগ্রহের ব্যাপারে তাঁহাদের মত জানাইয়া গিয়াছেন। পান্নায় হীরকের অস্তিত্বের পরিমাণ সন্তোষজনক বলিয়াই মনে হয়।

এইবার কয়েকটি বিখ্যাত ভারতীয় হীরকখণ্ডের কথা বলিব। প্রাচীন কালের যাবতীয় হীরকই ভারতবর্ষ হইতে পাওয়া গিয়াছে। এইসকল হীরকখণ্ডের অনেকের পশ্চাতে চিত্তাকর্ষক ঐতিহাসিক গল্প প্রচলিত আছে। ইহাদের কতকগুলির পয়া ও দুই-একটির অপয়া রত্ন হিসাবে নাম রহিয়াছে।

ভারতে প্রাপ্ত হীরকের মধ্যে গ্রেট মোগল (Great Mogul) নামক হীরক খণ্ডই বৃহত্তম। উহার ওজন প্রথম অবস্থায় ছিল ৭৮৭ ক্যারাট (ইংরেজী)। আমীর জুমলা উহা শাহজাহানকে উপহার দেন। আওরঙ্গজেবের সময়ে কোনো ভিনিসীয় মণিকার উহাকে 'রোজ কাট' (Rose cut) ধরনে কাটিয়া ২৪০ ক্যারাটের এক হীরক খণ্ড বাহির করে। কথিত আছে যে ইহাতে আওরঙ্গজেব এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি মণিকারকে রত্ন কাটিবার জন্য পারিশ্রমিক তো দেনই নাই, উপরন্তু ঐ মণিকারকে দশ হাজার টাকা জরিমানা করিয়াছিলেন। ১৬৬৫ খৃস্টাব্দে টাভার্নিয়েরর বিবরণের পর ইহার আর কোনো সংবাদ পাওয়া যায় না।

অরলফ— Orloff

মহীশূরের শ্রীরঙ্গমের এক বিগ্রহের নেত্র হইতে এক ফরাসী সৈন্য কর্তৃক উহা অপহৃত হয়। সৈন্যটি জাহাজে পলায়ন করিবার সময় জাহাজের প্রধান চালক উহাকে হস্তগত করে। পরে রাজপুত্র অরলফ (Prince Orloff) আমস্টার্ডাম হইতে ইহাকে ৯০০০০ পাউণ্ডে ক্রয় করিয়া রুশ সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় কাথারিনকে (Catharine II) উপহার

প্রদান করেন। উহা ভূতপূর্ব জারদের রাজদণ্ডের মণি ছিল। ইহার ওজন ১৯৪'৮ ক্যারাট (ইং) ও বর্ণ ঈষৎ পীত। ইহাও রোজ কাট ধরনে কর্তিত রত্নখণ্ড।

পিট বা রিজেণ্ট— Pit or Regent

১৭০১ খৃস্টাব্দে ইহাকে মাদ্রাজের অন্তর্গত পার্শিয়াল (Partial) খনি হইতে পাওয়া যায়। তৎকালীন মাদ্রাজের ব্রিটিশাংশের (Fort St. George) শাসনকর্তা উইলিয়ম পিট (William Pitt) ইহাকে ২০৪০০ পাউণ্ড মূল্যে ক্রয় করেন। সেজন্য উহার অন্যতম নাম পিট। তিনি উহাকে সুদক্ষ মণিকার দ্বারা কাটান। ইহাতে তাঁহার ব্যয় হয় ৫০০০ পাউণ্ড। প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া এই হীরকখণ্ডকে কাটার কাজ চলিয়াছিল। প্রথম অবস্থায় ইহার ওজন ছিল ৪১০ ক্যারাট। ব্রিলিয়াণ্ট ধরনে কর্তিত হইবার পর ইহার ওজন দাড়ায় ১৩৬'৯ ক্যারাট। ১৭১৭ খৃস্টাব্দে পিট ইহাকে ফ্রান্সের রিজেণ্ট অরলিন্সের ডিউকের (Duke of Orleans) নিকট ৮০০০০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় করেন। ১৭৯২ খৃস্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের সময় উহা অপহৃত হয়। পরে তস্করেরা উহাকে ফেরত দেয়। উহা এখন ফ্রান্সের লুভর জাদুঘরের (Luvre Museum) এপোলো গ্যালারিতে (Apollo Gallery) রক্ষিত আছে। উহার বর্তমান মূল্য ৪৮০০০০ পাউণ্ড।

কোহিনুর— Kohi-Noor

পৃথিবীর যাবতীয় হীরক রত্নের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বিখ্যাত হীরক। কথিত আছে যে প্রথম অবস্থায় ইহার ওজন ছিল ৭৯৩ ক্যারাট (মেট্রিক)। পরে ইহাকে কিছুটা কাটিয়া ১৯১ মেট্রিক ক্যারাটে (১৮৬ ইং ক্যারাট) আনা হয়। দক্ষিণ-ভারতের কোলারের খনি হইতে ইহাকে সম্ভবত পাওয়া যায়। ১৩০৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ইহার

ইতিহাস পাওয়া যায়। ইহার পূর্বের বিশেষ কোনো নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে অনেকে মনে করেন যে, মহাভারতের যুগে বর্ণিত যে স্যমন্তক মণির কথা শোনা যায় উহাই কোহিনুরের পূর্বের নাম। স্যমন্তক মণি সম্বন্ধে জানা যায় যে, যদুবংশীয় রাজা সত্রাজিতের এই মণিটি ছিল। সত্রাজিৎ উহা পরে নিজ ভ্রাতা প্রসেনজিৎকে দান করেন। প্রসেনজিৎ একবার মৃগয়ায় যাইয়া কোনো এক সিংহ কর্তৃক নিহত হন। পরে জাম্ববান সিংহকে বধ করিয়া মণিটিকে সংগ্রহ করে। শ্রীকৃষ্ণ মণিটিকে একদা প্রশংসা করায় সত্রাজিতের ধারণা জন্মে যে, শ্রীকৃষ্ণই ঐ মণি চুরি করিয়াছেন। নিজের অপবাদ দুর করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ মণিটির খোঁজ লইতে থাকেন এবং জাম্ববানের নিকট উহা আছে জানিয়া তাহাকে পরাজিত করিয়া মণিটি উদ্ধার করেন ও সত্রাজিৎকে উহা ফেরত দেন। ইহাতে সত্রাজিৎ অত্যন্ত প্রীত হইয়া নিজ কন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহ দেন এবং ঐ বিবাহে মণিটি শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দেন।

পৌরাণিক হইতে ঐতিহাসিক যুগে আসিলে আমরা সর্বপ্রথম উহাকে মালবের হিন্দু রাজার অধিকারে দেখিতে পাই। আলাউদ্দিন খিলিজী পরে ইহাকে অধিকার করেন। অতঃপর ইহা গোয়ালিয়ররাজ বিক্রমাদিত্যের হস্তগত হয়। তাঁহার নিকট হইতে হুমায়ুন ইহা পান। অপর মতে বলা হয় যে, বাবর ইহা আগ্রা হইতে লাভ করেন। শাহজাহানের আমলে ইহা ময়ূরসিংহাসনে সন্নিবিষ্ট ছিল। মোগল যুগের প্রায় শেষে ১৭৩৯ খৃস্টাব্দে নাদিরশাহ দিল্লী লুণ্ঠন করেন। তদানীন্তন মোগল সম্রাট মহম্মহ শাহ এই মণিটি রক্ষার জন্য উহা স্বীয় উষ্ণীষের মধ্যে লুকাইয়া রাখেন, কিন্তু নাদিরশাহ একজন রাজনটীর সাহায্যে ইহা জানিয়া লইতে সমর্থ হন। সাক্ষাৎকালে নাদিরশাহ

বলিলেন, "আসুন, আমরা বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ আমাদের উষ্ণীষ পরস্পরকে উপহার দিই।" পরাজিত মহম্মদ শাহের পক্ষে এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি তাঁহার উষ্ণীষটি নাদিরশাহের হস্তে উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন। নাদির-শাহ উষ্ণীষটি পাইবা মাত্রই উহা মহম্মদ শাহের সম্মুখেই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া উহার মধ্য হইতে মণিটি বাহির করিয়া ফেলেন। ইহা দেখিয়া গভীর দুঃখের সহিত মহম্মদশাহ আর্তনাদ করিয়া বলিয়া উঠেন, "ও কোহিনুর— হায় জ্যোতির পর্বত।" তখন হইতেই ইহার নাম কোহিনুর চলিতেছে। নাদিরশাহ নিহত হইলে উহা কাবুলাধিপতি আহম্মদ শাহ দুরানীর হস্তে যায়। পরে আহম্মদ শাহের এক বংশধর জামান শাহের হস্তে ইহা আসে। জামান শাহের এক ভ্রাতা তাঁহাকে অন্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন কিন্তু জামান শাহ কৌশলে মণিটি কারাগার-কক্ষের দেওয়ালে পুতিয়া রাখেন। কিছুদিন পরে দেওয়াল পরিষ্কার করিবার সময় একজন ভৃত্য উহা দেখিতে পাইয়া তদানীন্তন কাবুলরাজ শাহসুজাকে উহা প্রদান করে। আরও পরে শাহসুজাকে তাঁহার ভ্রাতা রাজ্য হইতে বিতাড়িত করায় তিনি পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের আতিথ্য গ্রহণ করেন। রণজিৎ সিংহ শাহসুজাকে ভরণপোষণের জন্য জায়গীর দান করেন। বিনিময়ে শাহসুজা ১৮১৬ খৃস্টাব্দে কোহিনুরটি রণজিৎ সিংহকে উপহার দান করেন। শেষজীবনে রণজিৎ সিংহ দীর্ঘ রোগভোগ করেন। ইহাতে তিনি মণিটি কোনো হিন্দু মন্দিরে দান করিবেন স্থির করেন। দানের পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। পরবর্তী দলীপ সিংহের নাবালক অবস্থায় ও দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের পর তদানীন্তন পাঞ্জাবের ব্রিটিশ শাসনকর্তা ডালহাউসী ক্ষতিপূরণের মধ্যে ইহাকে হস্তগত করেন। ইহা ১৮৪৯ খৃস্টাব্দের কথা। ১৮৫০ খৃস্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানি কোহিনুরটি সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে প্রদান করেন। ১৮৬২ খৃস্টাব্দে উহাকে কাটিয়া ১০৬·১ ইংরেজি ক্যারাটে (১০৮·৯ মেট্রিক ক্যারাট) আনা হয়। বর্তমানে ইহা ব্রিটিশ রাজমুকুটের অন্যতম রত্ন।

হোপ— Hope

পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ নীলাভ হীরক। কোলারের আকর হইতে ইহাকে পাওয়া যায়। ইহার ওজন ৪৪·৫ ক্যারাট (ইং)। টমাস হোপের (Thomas Hope) রত্নসমূহের অন্যতম বলিয়া ইহার নাম হোপ হইয়াছে। দুঃখ ও দুর্ভাগ্য দায়ক হিসাবে ইহার অপবাদ আছে। ১৬৪২ খৃস্টাব্দে টাভার্নিয়ে ইহাকে ভারত হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া যান। তখন ইহার ওজন ছিল ৬৭ ক্যারাট (ইং)। পরে কর্তিত হইয়া ইহার ওজন দাড়ায় ৪৪·৫ ক্যারাট (ইং)। টাভার্নিয়ে উহাকে ফরাসী সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের (Louis XVI) নিকট বিক্রয় করেন। রত্নটির সহিত দুর্ভাগ্যও টাভার্নিয়েকে অনুসরণ করে। টাভার্নিয়ে অশেষ কষ্ট পাইয়া রাশিয়ায় মারা যান। ষোড়শ লুইকে ফরাসী বিপ্লবে ফাঁসিতে প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়। এই ফরাসী বিপ্লবের সময় রত্নটি অপহৃত হয়। পরে উহা আমস্টার্ডামের কোনো মণিকারের কাছে যায়। তাহার পুত্র মণিটিকে চুরি করিয়া বেলিউ (Beaulieu) নামক একজন ফরাসীকে বিক্রয় করে। মণিকারপুত্রটি আত্মহত্যা করে। বোলিউ উহাকে যেদিন বিক্রয় করেন সেইদিনই মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর উহা হোপের হস্তে পড়ে। হোপের পৌত্র অর্থাভাবে রত্নটি কোনো আমেরিকান ধনীকে বিক্রয় করেন। অতঃপর কয়েক হাত ঘুরিবার পর একজন রুশ রাজপুত্র কোনো এক মহিলার জন্য উহা ক্রয় করেন। পরে ঐ রাজপুত্র মহিলাটিকে নিজেই হত্যা করেন এবং নিজে জনতার

হস্তে নিহত হন। অতঃপর মন্থারাইড্স্ (Montharides) নামক একজন গ্রীক বণিক উহা ক্রয় করিয়া তুর্কী স্থলতানের নিকট বিক্রয় করেন। বণিকটি উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া মারা যান। স্থলতান তাঁহার বেগমকে উহা উপহার দেন কিন্তু নিজেই বেগমকে পিস্তলদ্বারা হত্যা করেন। অবশেষে ম্যাকলীন (Maclean) নামক একজন ধনী আমেরিকান সংবাদপত্র-ব্যবসায়ী উহাকে ক্রয় করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার শিশুপুত্র মোটরচাপা পড়িয়া মারা যায়। মিসেস ম্যাকলীন উহা বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু কেহই এই অশুভ রত্নটিকে ক্রয় করিতে অগ্রসর হইতেছিল না।

অন্যান্ত বিখ্যাত ভারতীয় হীরক রত্নের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য বরোদার গাইকোয়াড়ের সম্পত্তি আকবর শাহ (৭১ ইং ক্যারাট) ও এম্প্রেস ইউজেনি (Empress Eugenie—৫১ ইং ক্যারাট), পারস্থের শাহের দরিয়া-ই-নুর (১৮৬ ইং ক্যারাট। মাস্কীলীনের—Maskelyne— মতে এই আয়তাকার হীরকখণ্ড এবং ১৬৪২ খৃস্টাব্দে গোলকুণ্ডায় টাভানিয়ে যে আয়তাকার হীরকখণ্ড দেখিয়াছিলেন—উহারা অভিন্ন) ও তাজিমা (১৪৬ ইং ক্যারাট), নিজামের সম্পত্তি নিজাম (২৭৭ ইং ক্যারাট), ওয়েস্টমিনিস্টারের ডিউকের নাসাক (Nassak—৭৮.৬ ইং ক্যারাট), সাক্সন মুকুটমণি ড্রেসডেন গ্রীণ (Dresden Green—৪০ ইং ক্যারাট), অষ্ট্রিয়া রাজের মুকুটমণি ফ্লোরেণ্টাইন (Florentine—১৩৩.২ ইং ক্যারাট)। টাভার্নিয়ের বিবরণে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার অন্য নাম অষ্ট্রিয়ান—Austrian বা গ্রাণ্ড ডিউক অব টাস্কানি— (Grand Duke of Tuscany), পাশা অফ ইজিপ্ট (Pasha of Egypt— ৪০ ইং ক্যারাট) হোয়াইট সাক্সন (White Saxon—৪৮.৭৫ ইং ক্যারাট), স্টার অফ এষ্টি

(Star of Este—২৫.২৭ ইং ক্যারাট), রুশ মুকুটমণি মুন অফ দি মাউন্টেন্স্ (Moon of the Mountains— ইহা নাদির শাহ কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়), সান্সি (Sancy— ৫৩.৭৫ ইং ক্যারাট; অনেক হাত ঘুরিয়া ইহা পুনরায় ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছে) ইত্যাদি।

১৭২১ খৃস্টাব্দে ব্রাজিলে হীরক আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে ভারতীয় হীরক শিল্প প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়। ব্রাজিলের মাইনাস গেরিস (Minas Geraes) ও বাহিয়া (Bahia) নামক প্রদেশদ্বয়েই প্রধানতঃ হীরক পাওয়া যায়। উক্ত প্রদেশের অন্তর্গত নদীর বালু ও পললে হীরকখণ্ড পাওয়া যায়। এই সকল হীরকবাহী পদার্থকে ধুইয়া হীরকখণ্ডকে সংগ্রহ করা হয়। ব্রাজিলে হীরক সংগ্রহের পদ্ধতি অতি পুরাতন। ১৮৭০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত প্রধানতঃ ব্রাজিলই পৃথিবীর বাজারে হীরক সরবরাহ করিত। বর্তমানে ব্রাজিল হইতে বিশেষ রত্ন হীরক আসে না।

ব্রাজিলে প্রাপ্ত হীরকখণ্ডের মধ্যে ভার্গাস (Vargas) প্রধান। ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে মাইনাস গেরিসের অন্তর্গত প্যাট্রোসিনিও (Patrocinio) নামক স্থানে ইহাকে পাওয়া যায়। প্রথম অবস্থায় ইহার ওজন ছিল ৭২৬.৬ মেট্রিক ক্যারাট। পরে ইহাকে কাটিয়া ২৯টি হীরক খণ্ড বাহির করা হয়। বর্তমানে এইগুলি হ্যারি উইনস্টন (Harry Winston) নামক একজন আমেরিকাবাসীর সম্পত্তি।

স্টার অব দি সাউথ—Star of the South

১৮৫৩ খৃস্টাব্দে ইহাকে পাওয়া যায়। প্রথম অবস্থায় ইহার ওজন ছিল ২৫৪.৫ ইং ক্যারাট। পরে ইহাকে ব্রিলিয়াণ্ট ধরনে কাটিয়া ১২৫.৫ ইং ক্যারাটের এক হীরকখণ্ড বাহির করা হয়। বরোদার গাইকোয়াড় ইহাকে ৮০০০০ পাউণ্ড মূল্যে ক্রয় করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে ভাল্ (Vaal), অরেঞ্জ (Orange) প্রভৃতি নদীর তীর হইতে কয়েকখণ্ড হীরক পাওয়া যাওয়ায়, ঐ অঞ্চলে পূর্ণোদ্যমে হীরক সংগ্রহ চলিতে থাকে। আফ্রিকার প্রথম হীরক আবিষ্কার সম্বন্ধে জানা যায় যে, জন ওরিলী (John O' Reilly) নামক একজন উটপাখী-শিকারী একদা এক বুওর কৃষকের ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ কৃষকের ছেলেরা কয়েকখণ্ড পাথর লইয়া খেলা করিতেছিল। ঐগুলিকে মূল্যবান মনে করিয়া তিনি উহার একটি চাহিয়া লন। ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে ডাঃ আথারস্টোন (Dr. Atherstone) উহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, প্রকৃতপক্ষে উহা একখণ্ড হীরক।

পূর্বোক্ত ভাল্, অরেঞ্জ প্রভৃতি নদীর বালু হইতেই প্রথম প্রথম হীরক সংগ্রহ চলিত। ১৮৭১ খৃস্টাব্দে বিখ্যাত কিম্বার্লির আকর আবিষ্কৃত হয়। বর্তমানে ইহাই পৃথিবীর প্রধান হীরকশিল্প কেন্দ্র। কিম্বার্লি অঞ্চলে প্রথম প্রথম নদীর বালু ও পলল হইতে হীরক সংগ্রহ হইত। পরে নীচের দিকে খুঁড়িতে খুঁড়িতে দেখা গেল যে নীচের পীত মৃত্তিকা (Yellow Ground) ও আরও নীচের নীল মৃত্তিকা ও (Blue Ground) হীরক সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। বর্তমানে কিম্বার্লি খনিতে প্রধানত এই নীল মৃত্তিকা হইতেই হীরক পাওয়া যায় কিম্বার্লির হীরকবাহী শিলার আকৃতি আগ্নেয়গিরির নলের ন্যায়। প্রথম প্রথম নীল মৃত্তিকা খনন করিয়া উপরে আনিয়া ফেলিয়া রাখা হইত। বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসিয়া উহা আপনা আপনিই বিচূর্ণ ও বিজীর্ণ হইয়া যাইত। তখন উহা হইতে হীরকখণ্ড সংগ্রহ করা হইত। বর্তমানে গভীর খননের দ্বারা যে হীরকবাহী কিম্বার্লাইট শিলাখণ্ড তুলিয়া আনা হয় উহাকে প্রথমে চূর্ণ ও ধৌত করা হয়।

পরে গ্রীজ (grease) মাখানো পাতের উপর দিয়া হীরকসহ শিলা খণ্ডগুলিকে গড়াইয়া দেওয়া হয়। হীরকখণ্ডগুলি গ্রীজ পদার্থে আটকাইয়া যায় কিন্তু শিলাখণ্ডগুলি গড়াইয়া যায়। এইরূপে হীরক খণ্ডগুলিকে পৃথক করা হয়। বর্তমানে কিম্বার্লির খনিগুলিতে ৩৬০০ ফুটের অধিক নিম্নে খনন কার্য চলিতেছে। কিম্বার্লাইট শিলার মধ্যে হীরকের সহিত একপ্রকার লাল রঙের তামড়ি (Garnet) পাওয়া যায়। উহা কেপচুনি (Cape Ruby) নামে বাজারে উপরত্ন হিসাবে বিক্রীত হয়। কিম্বার্লিতে অনেকগুলি দল হীরকসংগ্রহের জন্য খননকার্যে ব্যাপৃত ছিল, কিন্তু পরে সিসিল রোডসের (Cecil Rhodes) প্রচেষ্টায় এইগুলি একত্রিত হইয়া দি বিয়ার্স কন্সলিডেটেড মাইন্স লিমিটেড (De Beers Consolidated Mines Ltd.) নামক একটি খনন সম্প্রদায় গঠন করিয়া কার্য করিতেছে। ইহাদের পাঁচটি বিখ্যাত হীরকের খনি আছে: (১) কিম্বার্লি (Kimberley), (২) দি বিয়ার্স (De Beers), (৩) ওয়েসেল্টন (Wesselton), (৪) বুল্টফন্টিন (Bultfontein) ও (৫) ডুটইটস্প্যান (Dutoitspan)।

দক্ষিণ-আফ্রিকার অন্যান্য বিখ্যাত হীরকখনিগুলির মধ্যে ট্রান্সভালের (Transvaal) প্রীমিয়ার (Premier) খনি অন্যতম। ইহার আয়তন ৮০ একর ও সেদিন পর্যন্ত ইহাই পৃথিবীর বৃহত্তম হীরকখনি ছিল। বর্তমানে টাঙ্গানাইকার (Tanganyika) মোয়াডুই (Mwadui) খনিই পৃথিবীর বৃহত্তম হীরকখনি। ১৯৪১ খৃস্টাব্দে কানাডার ভূবিদ্ (Geologist) ডাঃ গর্ডন উইলিয়াম্সন্ (Dr. Gordon Williamson) ইহাকে আবিষ্কার করেন। অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের (Orange Free State) জাগার্সফন্টিন (Jagersfontein) আফ্রিকার আর-একটি বিখ্যাত হীরকখনি।

আফ্রিকার নদীর বালু্ ও পলল হইতেই আজকাল অধিক হীরক সংগ্রহ করা হইতেছে। বেলজিয়ান কঙ্গোর (Belgian Congo) সিকাপা (Tshikapa), ফরাসী নৈরক্ষিক আফ্রিকার (French Equatorial Africa) হটিসঙ্গ (Hautesangha) ও লোবায়ি (Lobaye), ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, এঙ্গোলা (Angola), সিয়েরা লিওন (Sierra Leone), স্বর্ণ উপকূল (Gold Coast), লাইবেরিয়া (Liberia) প্রভৃতি স্থান হইতেও এইরূপভাবে হীরক সংগ্রহ করা হয়।

ভারতবর্ষ, ব্রাজিল ও আফ্রিকা ছাড়া পৃথিবীর আর যেসকল স্থানে হীরক পাওয়া যায় তাহার মধ্যে দক্ষিণ-আমেরিকার ব্রিটিশ গায়ানা (British Guiana), অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েল্স্ (New South Wales), দক্ষিণ-আমেরিকার ভেনিজুয়েলা (Venezuela), সোভিয়েট রাশিয়া (উরাল পর্বত অঞ্চল হইতে) ও আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের আর্কান্সাস্ (Arkansas) উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের জর্জিয়া (Georgia) উত্তর ক্যারোলিনা (North Carolina) প্রভৃতি স্থানের নদীর বালু্ ও হিমবাহের (glacier) শিলা ও মৃত্তিকাতে হীরকখণ্ড সময় সময় পাওয়া যায়।

আফ্রিকাতে প্রাপ্ত হীরকখণ্ডের মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছে কুলিনান (Cullinun)। ১৯০৫ খৃস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে ট্রান্সভালের প্রীমিয়ার খনিতে ইহাকে পাওয়া যায়। প্রথম অবস্থায় ইহার ওজন ছিল ৩০২৫'৭৫ ইং ক্যারাট (৩১০৬ মেট্রিক ক্যারাট) এবং ইহাই পৃথিবীর বৃহত্তম হীরকখণ্ড। ইহাকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে, ইহা আরও বৃহৎ কোনো হীরকখণ্ডের অংশ হইবে। দক্ষিণ-আফ্রিকার ট্রান্সভাল্ সরকার উহাকে দেড়লক্ষ পাউণ্ড মূল্যে ক্রয় করিয়া ১৯০৭ খৃস্টাব্দে

(তদানীন্তন ব্রিটিশ সম্রাট) সপ্তম এডোয়ার্ডের জন্মদিনে তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন। ১৯০৮ খৃস্টাব্দে আমস্টার্ডামের 'আসার অ্যাণ্ড কোম্পানি' (Asscher & Co.) ইহাকে ব্রিলিয়াণ্ট ধরনে কাটিয়া ১০৫টি হীরক খণ্ড বাহির করে। ইহাদের চারটি বেশ বৃহদাকার পাঁচটি মধ্যমাকার এবং বাকীগুলি ক্ষুদ্রাকার রত্ন। প্রথম চারিটির ওজন যথাক্রমে ৫১৬'৫ ইং ক্যারাট (৫৩০'২ মেট্রিক ক্যারাট), ৩০৯'৩ ইং ক্যারাট (৩১৭'৪ মেট্রিক ক্যারাট), ৯২ ইং ক্যারাট ও ৬২ ইং ক্যারাট। কর্তিত রত্নগুলির (১০৫টির) ওজন ১০৬৩ মেট্রিক ক্যারাট অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৬৫'৭৫ ভাগ বাদ পড়িয়াছে। প্রথম দুইটি বর্তমানে পৃথিবীতে সর্ব বৃহৎ ব্রিলিয়াণ্ট ধরনে কাটা হীরক রত্ন। ইহাদের প্রথমটির নাম স্টার অফ আফ্রিকা (Star of Africa) অথবা ১নং কুলিনান (Cullinun No. 1.) এবং দ্বিতীয়টির নাম ২নং কুলিনান (Cullinun No. 2.) প্রথমটি জল বিন্দুর আকারের আর দ্বিতীয়টি আয়তাকার। বর্তমানে ঐ গুলি ব্রিটিশ রাজের মুকুটমণি।

ট্রান্সভালের অপর বিখ্যাত হীরকখণ্ডের নাম যঙ্কার (Jonker)। ১৯৩৪ খৃস্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে ইহাকে জে. যঙ্কার (J. Jonker) ট্রান্সভালের ইলাণ্ডস্‌ফন্টিন (Elandsfontein) নামক স্থানে লাভ করেন। ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের হ্যারি উইনস্টন ইহাকে দেড়লক্ষ পাউণ্ড মূল্যে ডায়মণ্ড কর্পোরেশনের (Diamond Corporation Ltd.) নিকট হইতে ক্রয় করেন। তিনি ইহাকে কাটাইয়া ১২টি রত্ন লাভ করেন। প্রথম অবস্থায় যঙ্কারের ওজন ছিল ৭২৬ মেট্রিক ক্যারাট। উহা হইতে যে বৃহত্তমটি পাওয়া যায় তাহার ওজন ১৪২'৯ মেট্রিক ক্যারাট। ইহাকে পরে আবার কাটাইয়া ১২৫'৩ মেট্রিক ক্যারাটের একটি রত্ন পাওয়া যায়।

স্টার অফ সাউথ আফ্রিকা— Star of South Africa

ইহাকে ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে অরেঞ্জ নদীর তীর হইতে পাওয়া যায়। তখন ইহার ওজন ছিল ৮৩·৫ ইং ক্যারাট। উহাকে আর্ল অফ ডাডলি (Earl of Dudley) ২৫০০০ পাউণ্ড মূল্যে ক্রয় করেন। সেজন্য ইহার অন্য নাম ডাডলি। উহাকে কাটাইয়া ৪৬·৫ ইং ক্যারাটের একটি রত্ন পাওয়া যায়।

এক্সেলসিয়র— Excelsior

ইহাকে ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে জাগার্সফণ্টিনে পাওয়া যায়। প্রথমে ইহার ওজন ছিল ৯৬৯·৫ ইং ক্যারাট (৯৯৫·৩ মেট্রিক ক্যারাট)। ইহাকে কাটিয়া ১০টি বৃহৎ রত্ন বাহির করা হয়। ইহা পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহৎ হীরক রত্ন।

জুবিলী— Jubilee

১৮৯৫ খৃস্টাব্দে ইহাকে জাগার্সফণ্টিনে পাওয়া যায়। প্রথমে ইহার ওজন ছিল ৬৩৪ ইং ক্যারাট (৬৫০·৮ মেট্রিক ক্যারাট)। পরে ইহাকে কাটিয়া ২৩৯ ইং ক্যারাটের (২৪৫·৩ মেট্রিক ক্যারাট) একটি রত্ন পাওয়া যায়।

টিফানী— Tiffany

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের টিফানী কোম্পানির সম্পত্তি বলিয়া ইহার নাম এইরূপ হইয়াছে। কিম্বার্লিতে ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে ইহাকে পাওয়া যায়। ইহার ওজন ১২৫·৫ ক্যারাট (১২৮·৫ মেট্রিক ক্যারাট)।

পোর্টার রোডস্— Porter Rhodes

কিম্বার্লিতে ইহাকে পাওয়া যায়। ইহার ওজন ১৫০ ইং ক্যারাট।

ভিক্টোরিয়া— Victoria

৪৫৭.৫ ইং ক্যারাটের হীরকখণ্ডকে কাটিয়া ১৮০ ইং ক্যারাটের এই রত্নটি পাওয়া যায়। হায়দ্রাবাদের নিজাম ইহাকে ৪লক্ষ পাউণ্ড মূল্যে ক্রয় করেন।

সিয়েরা লিওনে ১৯৪৩ খৃস্টাব্দে একটি ৫৩২ মেট্রিক ক্যারাটের ও ১৯৪৫ খৃস্টাব্দে একটি ৭৭০ মেট্রিক ক্যারাটের হীরকখণ্ড পাওয়া গিয়াছে।

লিবারেটর— Liberator

ইহার প্রাথমিক ওজন ছিল ১৫৫ মেট্রিক ক্যারাট। ভেনিজুয়েলায় ইহাকে পাওয়া যায়। ১৯৪৩ খৃস্টাব্দে যুক্ত রাষ্ট্রের হ্যারি উইনস্টন ইহাকে ক্রয় করেন। ইহা হইতে ৪টি রত্ন পাওয়া যায়। বৃহত্তমটি ৩৯.৮ মেট্রিক ক্যারাটের।

—

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

॥ ১৩৫০ বৈশাখ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে ॥

প্রতি গ্রন্থ আট আনা

১। সাহিত্যের স্বরূপ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চতুর্থ মুদ্রণ
২। কুটিরশিল্প ॥ শ্রীরাজশেখর বসু। চতুর্থ মুদ্রণ
৩। ভারতের সংস্কৃতি ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। চতুর্থ মুদ্রণ
*৪। বাংলার ব্রত ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তৃতীয় মুদ্রণ
*৫। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীয় মুদ্রণ
৬। মায়াবাদ ॥ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। তৃতীয় মুদ্রণ
৭। ভারতের খনিজ ॥ শ্রীরাজশেখর বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
*৮। বিশ্বের উপাদান ॥ শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। তৃতীয় মুদ্রণ
৯। হিন্দু রসায়নী বিদ্যা ॥ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*১০। নক্ষত্র-পরিচয় ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত। তৃতীয় মুদ্রণ
*১১। শারীরবৃত্ত ॥ ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল। তৃতীয় মুদ্রণ
১২। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*১৩। বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ ॥ শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। তৃতীয় মুদ্রণ
১৪। আয়ুর্বেদ-পরিচয় ॥ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৫। বঙ্গীয় নাট্যশালা ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় মুদ্রণ
*১৬। রঞ্জনদ্রব্য ॥ ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৭। জমি ও চাষ ॥ ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায়চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৮। যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প ॥ ডক্টর কুদরত-এ-খুদা। দ্বিতীয় মুদ্রণ
১৯। রায়তের কথা ॥ প্রমথ চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২০। জমির মালিক ॥ শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১। বাংলার চাষী ॥ শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২২। বাংলার রায়ত ও জমিদার ॥ ডক্টর শচীন সেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৩। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ॥ শ্রীঅনাথনাথ বসু। তৃতীয় মুদ্রণ
২৪। দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি ॥ শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৫। বেদান্ত-দর্শন ॥ ডক্টর রমা চৌধুরী। দ্বিতীয় মুদ্রণ

* সচিত্র

২৬। যোগ-পরিচয় ॥ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ
২৭। রসায়নের ব্যবহার ॥ ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহসরকার। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*২৮। রমনের আবিষ্কার ॥ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*২৯। ভারতের বনজ ॥ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩০। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস ॥ রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১। ধনবিজ্ঞান ॥ শ্রীভবতোষ দত্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
*৩২। শিল্পকথা ॥ শ্রীনন্দলাল বসু। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩৩। বাংলা সাময়িক সাহিত্য ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪। মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ ॥ শ্রীরজনীকান্ত গুহ
*৩৫। বেতার ॥ ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৩৬। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ॥ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
৩৭। হিন্দু সংগীত ॥ প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীইন্দিরা দেবী
৩৮। প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা ॥ শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯। কীর্তন ॥ অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
*৪০। বিশ্বের ইতিকথা ॥ শ্রীসুশোভন দত্ত
৪১। ভারতীয় সাধনার ঐক্য ॥ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৪২। বাংলার সাধনা ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৪৩। বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪। মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী ॥ ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫। নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ ॥ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
*৪৬। প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা ॥ ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭। সংস্কৃত সাহিত্যের কথা ॥ শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮। অভিব্যক্তি ॥ শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
*৪৯। হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা ॥ ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০। ন্যায়দর্শন ॥ শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ শাস্ত্রী
৫১। আমাদের অদৃশ্য শত্রু ॥ ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২। গ্রীক দর্শন ॥ শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩। আধুনিক চীন ॥ থান য়ুন শান
৫৪। প্রাচীন বাংলার গৌরব ॥ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
*৫৫। নভোরশ্মি ॥ ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার

* সচিত্র

৫৬। আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন ॥ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
*৫৭। ভারতের বনৌষধি ॥ ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায়
৫৮। উপনিষদ্ ॥ মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
৫৯। শিশুর মন ॥ ডক্টর সুখেনলাল ব্রহ্মচারী। দ্বিতীয় মুদ্রণ
৬০। প্রাচীন ভারতে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ॥ ডক্টর গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার
৬১। ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
*৬২। ভারতশিল্পে মূর্তি ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
*৬৩। বাংলার নদনদী ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৬৪। ভারতের অধ্যাত্মবাদ ॥ ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম
৬৫। টাকার বাজার ॥ শ্রীঅতুল সুর
৬৬। হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৬৭। শিক্ষাপ্রকল্প ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
৬৮। ভারতের রাসায়নিক শিল্প ॥ ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস
*৬৯। দামোদর পরিকল্পনা ॥ ডক্টর চন্দ্রশেখর ঘোষ
৭০। সাহিত্য-মীমাংসা ॥ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
*৭১। দূরেক্ষণ ॥ শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৭২। তেল আর ঘি ॥ ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
৭৩। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান ॥ প্রমথ চৌধুরী
৭৪। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা ॥ শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৭৫। বিভক্ত ভারত ॥ শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী
৭৬। বাংলার জনশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
*৭৭। সৌরজগৎ ॥ ডক্টর নিখিলরঞ্জন সেন
*৭৮। প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৭৯। ভারত ও মধ্য এশিয়া ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮০। ভারত ও ইন্দোচীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮১। ভারত ও চীন ॥ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী
৮২। বৈদিক দেবতা ॥ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
*৮৩। বঙ্গসাহিত্যে নারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
*৮৪। সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
*৮৫। বাংলার স্ত্রীশিক্ষা ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

* সচিত্র

* সচিত্র

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিশ্বপরিচয় ১।৷০

সুরেন ঠাকুর
বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ ২।৷০

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা ২।০

শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
পৃথ্বীপরিচয় ১।০

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রাণতত্ত্ব ২।০

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য
আহার ও আহার্য ১।০

শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
বাংলা সাহিত্যের কথা ১।৷০

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা উপন্যাস ২৲

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
ভারত-দর্শনসার ৩।০

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
ব্যাধির পরাজয় ১।৷০
পদার্থবিদ্যার নবযুগ ৩৲

শ্রীনির্মলকুমার বসু
হিন্দুসমাজের গড়ন ২।৷০

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
হিউএনচাঙ ২।৷০, ৩৲

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
পূজা-পার্বণ ৩৲, ৪৲